বিশ্ব-বৈচিত্র্য।

১ম খণ্ড—জল।

২য় খণ্ড—স্থল।

৩য় খণ্ড—আকাশ।

বিশ্ব-বৈচিত্র্য

বা

দশ্যাবলী।

খোপাধ্যায় প্রণীত।

(WONDERS OF THE WORLD).

Calcutta:

C. AUDDY & CO., BOOKSELLERS AND PUBLISHERS,
58 & 12, WELLINGTON STREET.

1907.

যাঁহার কৃপায়
দুর্লভ মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করিয়া
জগতে যাহা কিছু আশ্চর্য্য বস্তু দেখিয়াছি এবং
সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি ; আমার সেই
পরমারাধ্য, প্রত্যক্ষ দেবতা, পিতৃদেব

শ্রীল শ্রীযুক্ত নীলমণি মুখোপাধ্যায়

মহানুভবের শ্রীচরণ-পঙ্কজে সেই সমস্ত
অমূল্য রত্ন উৎসর্গ করিয়া ধন্য হইলাম।

সেবকাধম
আশুতোষ।

ভূমিকা।
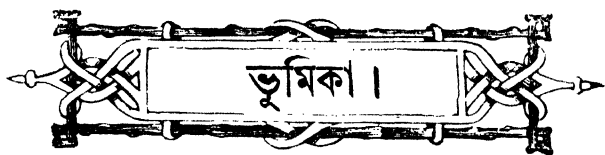
এই বিশ্বসংসার লীলাময় বিধাতার বিচিত্র লীলা। এই বৈচিত্র্যময় সংসারের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, প্রেমিক ভাবুকের নয়ন মন ভগবানের অপরূপ সৃষ্টি-কৌশল দর্শন করিয়া বিস্ময়রসে আপ্লুত হয়। এই অদ্ভুত বিশ্ব-রচনার মধ্যে যে কত শত বিস্ময়কর ব্যাপার দৃষ্টি-পথে পতিত হয় তাহার সংখ্যা করা যায় না। সেই বৈচিত্র্যময় সৃষ্টি সমুদয়ে বিশ্বশিল্পীর রচনা-নৈপুণ্য ও লীলা-বৈদগ্ধ্য দর্শনে হৃদয় যুগপৎ আনন্দ, বিস্ময় ও ভক্তিরসে অভিষিক্ত হয়; এবং আবেগোচ্ছ্বসিত কণ্ঠ স্বতঃই তাঁহাকে 'জয় লীলা-রসময়' বলিয়া পুনঃপুনঃ স্মরণ করিয়াও পরিতৃপ্ত হয় না। সৃষ্টির সেই সমস্ত অগণিত বিচিত্র বস্তু পৃথিবীর নানাস্থানে অবস্থিত। একজনের ভাগ্যে ও ক্ষমতায় সে সমস্ত দর্শন বা পর্য্যবেক্ষণ করা সম্ভবপর নহে। সভ্যজগতের অনেকানেক বিজ্ঞ পর্য্যটক পৃথিবীর নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া বহুবিধ অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়া তাহাদের বিবরণ স্ব স্ব গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এইরূপ বহুবিধ গ্রন্থ বিভিন্ন ভাষায় বিদ্যমান রহিয়াছে। বাঙ্গালায় এরূপ পুস্তকের অভাব প্রত্যেক জ্ঞানপিপাসু বঙ্গসন্তানই এপর্য্যন্ত অনুভব করিয়া আসিতেছেন। সেই অভাব কথঞ্চিৎ দূরীকরণার্থ নানা ভাষার নানা গ্রন্থ অধ্যয়নপূর্ব্বক ও নানাস্থান পর্য্যটন করিয়া আমি এই শুভ উদ্যমে প্রবৃত্ত হইয়াছি। উপস্থিত গ্রন্থে পূর্ব্বতন পর্য্যটকদিগের লিখিত বিবরণ সংগ্রহ ব্যতীত নানা দেশ ভ্রমণকালে নিজ প্রত্যক্ষীভূত কতিপয় বিচিত্র ব্যাপারেরও বৃত্তান্ত সন্নিবেশিত হইয়াছে।

সাধারণতঃ সৃষ্টির আশ্চর্য্য বস্তু ও ঘটনাগুলি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি মনুষ্যকৃত এবং অন্যগুলি ঈশ্বরকৃত বা স্বাভাবিক। মনুষ্যকৃত অদ্ভুত সৃষ্টিনিচয়ের দশটীমাত্র ইতিপূর্ব্বে মৎকৃত "পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্য্য" নামক পুস্তকে বিবৃত হইয়াছে। বর্ত্তমান গ্রন্থে কেবল কতিপয় ঈশ্বরকৃত বা প্রাকৃতিক দৃশ্য ও ঘটনাবলীর বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে। এই প্রাকৃতিক বিচিত্র বস্তু সমুদয়ও উৎপত্তি অনুসারে তিন স্থানে নির্দ্দেশ করা যায়—জলে, স্থলে ও অন্তরীক্ষে। জলস্থিত বহুবিধ বিস্ময়কর মৎস্য ও অন্যান্য প্রাণিকুলের বিবরণ, জলের বিবিধ অবস্থা ও গতির বিবরণ পাঠে একত্রে জ্ঞান ও আনন্দ উভয়ই প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্থলেরও সেইরূপ বহুবিধ অদ্ভুত আকৃতি ও প্রকৃতির মানব ও অন্যান্য বিচিত্রস্বভাব প্রাণী ও উদ্ভিদের বৃত্তান্ত নিতান্ত কৌতূহলোদ্দীপক। ব্যোমমার্গে গ্রহ নক্ষত্রাদির অবস্থান ও গতিবিধি, বায়ুমণ্ডল ও আলোকাদির বিবিধ অবস্থা ও ক্রিয়ার বিবরণ আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেরই অবশ্য জ্ঞাতব্য ও শিক্ষাপ্রদ। এই সমস্ত বহুবিধ বিবরণ প্রাসঙ্গিক ইতিহাস সহিত এই গ্রন্থের অন্তর্নিহিত করা হইয়াছে।

কলিকাতা রিপন কলেজের অন্যতম শিক্ষক আমার অনন্যহৃদয় বন্ধু শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ঘোষাল বি, এ, মহোদয় এই গ্রন্থ প্রণয়নকল্পে বিশেষ সাহায্য করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। যাহাদের জন্য এই পুস্তক রচিত হইল, ইহা তাহাদের কথঞ্চিৎ উপকারে আসিলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব। ইতি—

৫ই আশ্বিন, ১৩১৪। গ্রন্থকার।

সূচীপত্র।

জল।

স্থল।

অদ্ভুত প্রাকৃতিক দৃশ্য—

অদ্ভুত জীব—

আকাশ।

অন্তরীক্ষ জল—

আলোকের নানাবিধ ক্রিয়া—

১ম খণ্ড।

জল।

মৎস্য-নারী।

বিশ্ব-বৈচিত্র্য

বা

জগতের অদ্ভুত দৃশ্যাবলী

মৎস্য-নারী।
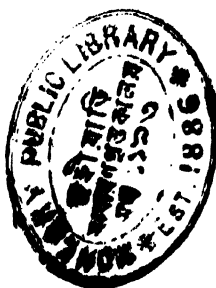
সর্ব্বদেশে সকল সময়ে জনসাধারণ মধ্যে এই কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে, যে অপরিমেয় সমুদ্র-গর্ভে অর্দ্ধ মনুষ্য ও অর্দ্ধ মৎস্যের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট জীব বাস করিরা থাকে। কিন্তু অধুনাতন বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন যে, বিশ্বরাজ্যে ওরূপ প্রাণীর অস্তিত্ব কখনই সম্ভবপর নহে; উহা কেবল কাল্পনিক কথা মাত্র। এ কথা কিন্তু সম্পূর্ণ ভুল, সেই অপরিসীম-শক্তি-সম্পন্ন বিশ্বাধিপতি মনে করিলে সকল প্রকার বস্তুই সৃষ্টি করিতে পারেন; এবং ইহা যে কাল্পনিক কথা মাত্র নহে, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তন্মধ্যে কয়েকটী সন্নিবেশিত হইল।

মেগাস্থিনিস্ লিখিয়া গিয়াছেন যে, টাপ্রোবানা বা লঙ্কাদ্বীপের নিকটবর্ত্তী সমুদ্রে স্ত্রীলোকের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট জীব বাস করিয়া থাকে। ইলিয়ান নামক একজন বিখ্যাত লেখক লিখিয়াছেন যে দৈত্যাকৃতি মৎস্য সমুদ্রমধ্যে বাস করিয়া থাকে। ভারতবর্ষের পূর্ব্বতন পর্ত্তুগিজ ঔপনিবেশিকগণ কহিতেন যে পূর্ব্ব-সমুদ্রে যথার্থ সাগর-নর দৃষ্ট হইয়া থাকে। অনেক নাবিক বহুদিন সমুদ্রবাসের পর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শপথ করিয়া কহিত যে, "আমরা অর্দ্ধমনুষ্য ও অর্দ্ধমৎস্যাকৃতি জীব স্বচক্ষে সন্দর্শন করিয়াছি।"

ভেলেটিন্ নামক এক ডচ্ ঔপনিবেশিক ধর্ম্মাধ্যক্ষ স্বীয় প্রাণিবৃত্তান্ত গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, টকোয়ানের গির্জ্জার নিকট ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে ২৯শে এপ্রেল প্রাতঃকালে সমুদ্রমধ্যে এক সমুদ্র-নর দৃষ্ট হইয়াছিল এবং ঐ দিবস অপরাহ্ণ সময়ে এক সাগর-নারীও নয়নগোচর হইয়াছিল। আর ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে বুরো দ্বীপের সমীপে এক সাগর-নারী কেবল যে জনগণের নয়ন পথবর্ত্তিনী হইয়াছিল তাহা নহে, সে মনুষ্যগণ কর্ত্তৃক ধৃতও হইয়াছিল। এই ধৃত সাগর-নারী দৈর্ঘ্যে প্রায় পাঁচ ফুট ছিল। সে স্থলোপরি আনীত হইয়া অবধি কোন খাদ্য ভোজন করে নাই, ইহাতে সে চারিদিন সাত ঘণ্টা কাল জীবিত ছিল।

উক্ত ভেলেটিন্ আরও কহিয়াছেন যে, এম্বয়না দ্বীপেও অনেক সাগরনর ও সাগর-নারী ধৃত হইয়াছিল। গির্জ্জাসমূহের প্রাদেশিক তত্ত্বাবধারক একটী ধৃত করিয়া তত্রত্য শাসনকর্ত্তা ভ্যাণ্ডারষ্টেলকে উপহার স্বরূপ প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই ধৃত অদ্ভুত প্রাণীর এক চিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল। এই প্রকার জীবের সমাচার ইয়ুরোপে প্রচারিত হইলে হলণ্ডীয় ইংরাজ রাজমন্ত্রী ১৭১৬ খৃষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর ভেলেটিনকে এক পত্র লেখেন। এই পত্রের মর্ম্ম এই যে, আমষ্টার্ডাম নগরে রুষের বিখ্যাত সম্রাট্ মহান্ পিটার উক্ত রাজমন্ত্রীর বাটীতে অতিথিস্বরূপ অবস্থিতি করিতেছেন। ভেলেটিন্ যদি অনুগ্রহ করিয়া একটী সাগর-নারী স্বদেশে আনয়ন করেন তাহা হইলে সম্রাট্ পিটার্ বড়ই প্রীত হইবেন।

ভেলেটিন আরও লিখিয়া গিয়াছেন যে হলণ্ড দেশ সমুদ্র অপেক্ষা অনেক নিম্ন। তজ্জন্য সমুদ্রের জল-প্লাবন নিবারণার্থ হলণ্ড দেশের পার্শ্ব সকল সুদৃঢ় মৃত্তিকা প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। ১৪৩০ খৃষ্টাব্দে তথায় একটী প্রবল ঝটিকা হয়। সমুদ্রের প্রচণ্ড উর্ম্মিমালাঘাতে ঐ প্রাচীর-শ্রেণীর কিয়দংশ ভগ্ন হওয়াতে, নিকটবর্ত্তী জনপদসমূহ সমুদ্রজলে প্লাবিত

হইয়াছিল। এক দিবস কতকগুলি স্ত্রীলোক নৌকারোহণে সেই প্লাবিত স্থান উত্তীর্ণ হইবার সময়, সহসা জলোপরি মনুষ্য মস্তকের ন্যায় একটী পদার্থ দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা নিকটে যাইয়া দেখিলেন যে একটী সুন্দরী নারী গভীর জলে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। উহার মস্তক হইতে নাভি পর্য্যন্ত সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গই স্ত্রীলোকের ন্যায়। কিন্তু নাভির অধোদেশ হইতে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মৎস্যাকৃতি। ইহার মস্তকে বিপুল কেশরাশি এবং মুখমণ্ডল ও বক্ষঃস্থল যুবতী রমণীর ন্যায়। এই সাগরনারীর এক প্রতিরূপ প্রদত্ত হইল।

নৌকাস্থিতা রমণীগণ সেই আশ্চর্য্য নীর-ললনা দর্শন করতঃ বিস্ময়াবিষ্টা হইয়া তাহাকে বলপূর্ব্বক ধৃত করিয়া হারলাম্ নগরে আনয়ন করিলেন। ক্রমে ক্রমে ঐ আশ্চর্য্য জীবের কথা নগরের শাসনকর্ত্তার কর্ণগোচর হইল। তিনি উহার বাসের জন্য যথোপযুক্ত স্থান নির্দ্দিষ্ট ও সেবার জন্য একটী পরিচারিকা নিযুক্ত করিয়া দিলেন। ঐ নীর-নারী মনুষ্যের নিকটে থাকিয়া মনুষ্যের অনেক আচার ব্যবহার শিক্ষা করিয়াছিল। মনুষ্যের ন্যায় দুগ্ধ ও রুটি আহার করিত; স্ত্রীলোকের ন্যায় পরিচ্ছদ ব্যবহার করিত। মনুষ্যের জীবনধারণোপযোগী অনেক কাজ কর্ম্মও শিক্ষা করিয়াছিল। এমন কি সে সূতা প্রস্তুত করিতে পারিত। অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয়, এই যে, তাহার অন্তঃকরণে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে সংস্কার জন্মিয়াছিল। খৃষ্টানদিগের সহবাসে থাকিয়া, খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি তাহার প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিয়াছিল। কিন্তু ঐ নীর-নারী মনুষ্য ভাষায় কথা কহিতে সমর্থ হয় নাই। সুতরাং তাহার মনের ভাব মনুষ্য লোকে প্রকাশিত হয় নাই। হার্লাম্ নগরে ঐ আশ্চর্য্য নারী ১৩ বৎসর কাল জীবিত ছিল। তাহার মৃত্যু হইলে, হার্লাম্বাসিগণ খৃষ্টধর্ম্মানুসারে তাহার সমাধি করিয়াছিল।

১৬১০ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন রিচার্ড হুইট্‌বোর্‌ন্‌ সাহেব সেণ্ট জন হারবর নামক সমুদ্র শাখায় একটী মৎস্য-নারী দেখিতে পাইয়াছিলেন। দূর হইতে তিনি ঐ নারীর মস্তকে, স্ত্রীজাতির ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ কেশজাল দেখিয়াছিলেন। তিনি তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিতে পারেন নাই। কারণ ঐ নীর-নারী নিকটে আসিলে কাপ্তেন সাহেব ভয়ে পলায়ন করিয়াছিলেন। তৎপরে মৎস্য-নারী নিকটবর্ত্তী আর একখানি নৌকার নিকট গমন করিয়া এক হস্তে উহার এক পার্শ্ব ধারণ করিয়াছিল। তদ্দর্শনে তরণীস্থিত নাবিকগণ ভীত হইয়া দণ্ড দ্বারা আঘাত করাতে সে তথা হইতে পলায়ন করে। তৎপরে ঐ নীরাঙ্গনা ঐরূপে অন্যান্য নৌকার নিকটবর্ত্তিনী হইয়াছিল। এই ঘটনায় তথাকার সমস্ত নাবিকেরা ভীত হইয়া তীরে পলায়ন করিয়াছিল। সুতরাং ঐ নীর-ললনার আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

গ্রীস দেশীয় প্রাচীন কবি হোমার, তাঁহার ওডেসি নামক বিখ্যাত গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন যে, সিসিলির নিকটবর্ত্তী কোন একটী ক্ষুদ্র দ্বীপে তিনটী সিন্ধু কামিনী বাস করিত। কোন তরণী দেখিলে তাহারা এরূপ সুমিষ্ট স্বরে গান করিত যে, তরণীস্থিত নাবিকগণ তরণীর গতি স্থগিত রাখিত। তাহারা সেই গান শুনিয়া বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া স্ব স্ব কার্য্য বিস্মৃত হইত। এমন কি অবশেষে তাহারা ক্ষুধা তৃষ্ণা পরিত্যাগ করিয়া তথায় প্রাণত্যাগ করিত। একদা ইউলিসিসের ঐ সঙ্কটাপন্ন স্থান পার হইবার বিশেষ আবশ্যক হইয়াছিল। তিনি যেরূপ আশ্চর্য্য বুদ্ধি কৌশলে ঐ স্থান পার হইয়াছিলেন, তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে। তিনি ঐ সঙ্কটাপন্ন স্থান পার হইবার সময় নাবিকদিগের কর্ণকুহর এরূপ দৃঢ়ভাবে বদ্ধ করিয়াছিলেন যে, যেন, তাহারা ঐ গান শুনিতে না পায়, অনন্তর নিজ শরীর জাহাজের সর্ব্বোচ্চ মাস্তলে দৃঢ় ভাবে বদ্ধ করিয়া রাখেন। ঐ স্থানে তরণী আগত হইলে ইউলিসিস, সেই

নীরাঙ্গনাদিগের সুমধুর গীতে এরূপ বিমোহিত হইয়াছিলেন যে, (তরণী স্থগিত রাখিলে কিরূপ বিপদ উপস্থিত হয়, জানা সত্ত্বেও) তরণী স্থগিত রাখিতে নাবিকদিগকে পুনঃ পুনঃ আদেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু নাবিকদিগের কর্ণকুহর বিশেষরূপে আবদ্ধ থাকায়, তাহারা ঐ সুমধুর গীত বা তাঁহার আদেশ কিছুই শুনিতে পায় নাই। সুতরাং তাহারা নিরাপদে ঐ বিষম সঙ্কটাপন্ন স্থান উত্তীর্ণ হইয়াছিল। ইউলিসিসের শ্রবণ-বিবর আবদ্ধ ছিল না; এহেতু তিনি গীতও শুনিলেন এবং প্রাণেও বাঁচিলেন।

১১৮৭ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের সসেক্স প্রদেশের সমুদ্রে একটা মীন-নর ধৃত হইয়াছিল। উহা ধৃত হইয়া ছয় মাস কাল জীবিত ছিল। উহা স্থলে পুরুষের ন্যায় অনেক বিষয় আচরণ করিত, কেবল কথা কহিতে পারিত না।

১৮১১ খৃষ্টাব্দের কোন একখানি বিখ্যাত সংবাদ পত্র হইতে আমরা দুইটা সমুদ্র মানব শিশুর বিষয় উদ্ধৃত করিলাম। ঐ বৎসর প্রবল ঝটিকার পরদিবস ইংলণ্ডের নিকটবর্ত্তী আইল্‌স্ অব ম্যান্ নামক ক্ষুদ্র দ্বীপে তিনজন বণিক জলবিহঙ্গম শিকার মানসে সমুদ্রের উপকূলে ভ্রমণ করিতেছিলেন। সহসা বিড়ালশিশুর ক্রন্দনধ্বনির ন্যায় এক প্রকার শব্দ তাঁহাদের কর্ণগোচর হইল। বহু অনুসন্ধানের পর তাঁহারা জলের সন্নিহিত পর্ব্বত গহ্বরে দুইটী অদ্ভুত জীব দেখিতে পাইলেন। উহাদিগের শরীর অর্দ্ধমনুষ্যাকৃতি ও অর্দ্ধমৎস্যাকৃতি। উহাদের মধ্যে একটী বিড়াল শিশুর ন্যায় ক্রন্দন করিতেছে এবং অপরটী প্রাণত্যাগ করিয়া ধরাপৃষ্ঠে পতিত রহিয়াছে। মৃতটীর শরীরে ক্ষতবিক্ষতের চিহ্ন সকল দৃষ্টিগোচর হইল। বোধ হয় গত রাত্রির ঝটিকায় প্রাণত্যাগ করিয়াছে। বণিকেরা স্বীয় বাসভূমি ডগলাস্ নগরে ঐ জীবিত প্রাণীটীকে আনয়ন করিয়াছিলেন। উহার শরীরের দৈর্ঘ্য, মস্তক

হইতে পুচ্ছ পর্য্যন্ত ন্যূনাধিক ৪ ফুট, স্কন্ধদেশের বিস্তার ৫ ইঞ্চি, ত্বক্ তরল পাটলবর্ণের এবং পুচ্ছভাগের শল্ক সকল কিঞ্চিৎ রক্তাভ। চুলগুলি স্পর্শ করিলে আঠার ন্যায় অনুভূত হয়; চুলগুলি দেখিতে ঠিক সমুদ্র-নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতোপরিস্থ শৈবালের মত। মুখ গহ্বর নিতান্ত অপ্রশস্ত ও দন্তহীন। শাবকটীকে জলে রাখা হইয়াছিল। সে তাহাতে পরমানন্দে সাঁতার দিত এবং পর্য্যাপ্ত পরিমাণে চিংড়ী মৎস্য আহার করিত। পেনকলমের ভিতর করিয়া দুগ্ধ ও জল মুখের নিকট ধরিলে আনন্দ সহকারে পান করিত। যে সময় সংবাদ পত্রে এই বিবরণটী লিখিত হয় তখন ঐ জীবটী জীবিত ছিল। কোন্ সময় মরিয়া যায়, তাহার কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

সন ১৩০৪ সালে এই কলিকাতা মহানগরীতে একবার একটী মৃত মৎস্য-নর আসিয়াছিল। সেটী দৈর্ঘ্যে ৫ হাত ছিল। বাজীকরেরা এক পয়সা দর্শনী লইয়া অনেককে দেখাইয়াছিল। আমরা স্বচক্ষে ইহা দেখিয়াছি, সুতরাং মৎস্য-নর বা মৎস্য-নারী সম্বন্ধে আর কোনরূপ অবিশ্বাসের কারণ নাই।

এই সকল বিবরণ পাঠ করিয়া স্বতঃই আমাদিগের মনে পুরাণ লিখিত মৎস্যাবতারের কথা উদিত হয়। কিন্তু পুরাণ প্রমাণে ভগবান্ অবিকল মীনশরীর ধারণ করিয়াছিলেন। কেবল তাঁহার ললাটদেশে বিশাল বিষাণ ছিল। অতএব আমাদিগের বর্ণিত অর্দ্ধ নর ও অর্দ্ধ মৎস্য, তাঁহার বংশমধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না। কিন্তু উপরোক্ত প্রমাণে বেশ বুঝা যায়, যে মৎস্য নরনারীর অস্তিত্ব কোনরূপ কল্পনা প্রসূত নহে।

উড্ডয়ন-শীল মৎস্য।

মৎস্য যে আকাশে উড়িতে পারে, ইহা এক অতীব বিস্ময়জনক ব্যাপার তাহার সন্দেহ নাই। শ্রবণ করিলেই আপাততঃ অসম্ভব

বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বিধাতার বিশ্বরাজ্যে কোন বস্তুই অসম্ভব হইতে পারে না। এ প্রকার মৎস্য বাস্তবিকই সমুদ্র মধ্যে বাস করিয়া থাকে। ইহাদের আকৃতি অধিক বড় হয় না, মদ্গুর প্রভৃতি মৎস্য অপেক্ষা কিঞ্চিৎ দীর্ঘ। ইহাদের পৃষ্ঠস্থ মেরুদণ্ডের বর্ণ নীলাভ, উদর শ্বেতবর্ণ এবং লাঙ্গুল ও ডানার অগ্রভাগ পীতের আভাযুক্ত রক্তিমবর্ণ। লাঙ্গুলাগ্র কণ্টকবৎ, মস্তক শল্কময় এবং সমস্ত অবয়ব কিয়ৎ পরিমাণে যেন চতুষ্কোণ। ইহার পক্ষদ্বয় দীর্ঘ ও নীলবর্ণে বিভূষিত; কোন কোন মৎস্যের চারিখানি পক্ষও থাকে। ইহারা যখন জলমধ্যে গমন করে তখন পক্ষদ্বয় মুড়িয়া লাঙ্গুলের সাহায্যে সন্তরণ করে। যখন উড়িতে থাকে তখন পক্ষদ্বয় বিস্তৃত করে এবং যতক্ষণ পক্ষ আর্দ্র থাকে ততক্ষণ
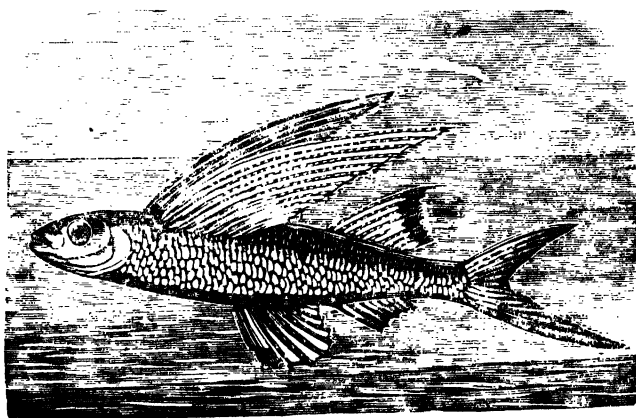
ইহারা উড়িতে থাকে। প্রায় একশত বা দেড় শত হস্ত গমন করিলে উহাদের পক্ষ শুষ্ক হয়; তখন তাহারা জলে একবার পক্ষ সিক্ত করিয়া লয়, এবং পুনর্ব্বার উর্দ্ধে উঠিতে থাকে, পরে ক্লান্ত হইলে জলে প্রত্যাগমন করে। ইহারা জল হইতে ছয় ফুটের অধিক উপরে উঠিতে পারে না এবং এককালে একশত গজের অধিক দূর গমন করিতে পারে না।

এই সকল মৎস্য সামুদ্রিক হিংস্র জীব বিশেষের ভয়েই তাহাদের আক্রমণ পথ অতিক্রম করিবার জন্য আকাশে উড্ডীয়মান হয়। আবার, আকাশস্থ সামুদ্রিক পক্ষীরা উহাদের দেখিতে পাইলে আক্রমণ করিয়া থাকে। ইহারা যখন উড্ডীয়মান হয় তখন দলবদ্ধ হইয়া অনেকে একত্রে উড়িয়া থাকে; উহারা কখন কখন ক্লান্ত হইয়া সমুদ্রোপরি গমনশীল জাহাজের উপরও পতিত হইয়া থাকে। আলোক দেখিতে ইহারা বড় ভালবাসে, এবং রাত্রিকালে কোন আলোক দেখিলে ঝাঁকে ঝাঁকে তাহার দিকে গমন করিতে থাকে। মৎস্যজীবীরা এই প্রকৃতি অবগত হইয়া কৌশল পূর্ব্বক উহাদিগকে ধৃত করে। ইহারা মনুষ্যেরও সুস্বাদু ভক্ষ্য বলিয়া আদৃত হইয়া থাকে। ইহারা তিন কিম্বা চারি জাতিতে বিভক্ত। ভূমধ্যসাগরে ও লোহিতসাগরে যাহারা বাস করে তাহারা অতি সুশ্রী। কিন্তু সাধারণ মৎস্য-পক্ষী প্রধান প্রধান সকল সমুদ্রেই দেখা যায়।

যমজ মৎস্য।

আমেরিকার অধ্যাপক সিলিমানের নাম ইয়ুরোপে সুবিখ্যাত। যাহা কিছু আশ্চর্য্য প্রাকৃতিক দৃশ্য অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতেন, জনগণের অবগতির জন্য তাহা প্রচার করিতেন। নিম্নলিখিত বিবরণটী তাঁহা কর্ত্তৃক প্রচারিত হইয়াছিল। পার্শ্বে যে চিত্র প্রদত্ত হইল তাহা এক যমজ ক্যাটফিস্ নামক মৎস্য। উত্তর ক্যারোলিনা প্রদেশে ফোর্ট জন্‌সন্ নামক স্থানে কেপ্ ফিয়ার রিভার নামক নদীর মুখভাগে উক্ত যমজমৎস্য ধৃত হইয়াছিল। এই যমজ মৎস্যের মধ্যে একটী বৃহত্তর ও অপরটী ক্ষুদ্রতর; উভয়েরই উদর একখানি চর্ম্মদ্বারা সংযুক্ত। ইহাতে বৃহত্তর মৎস্যটী যখন পৃষ্ঠভাগ উপর দিকে রাখিয়া সন্তরণ করিত, তখন তন্নিম্নস্থ ক্ষুদ্রতর মৎস্যটী অবশ্যই পৃষ্ঠভাগ অধোভাগে রাখিয়া সন্তরণ

করিত। এবং বৃহত্তর মৎস্যটী যখন কোন ভক্ষ বস্তু গ্রহণ করিত, ক্ষুদ্রতর মৎস্যটী তখন উক্ত ভক্ষ্যের ভোজনাবশিষ্ট যৎকিঞ্চিৎ অংশ মাত্র লাভ করিত। সর্ব্বাংশেই ক্ষুদ্রতরকে বৃহত্তরের অধীন হইয়া চলিতে হইত।
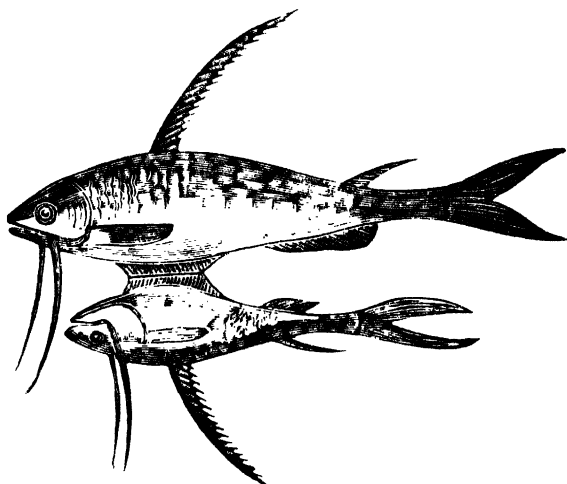
এরূপ যমজ মৎস্য পৃথিবীর আর কোথাও প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, ইহাতে অনুভব হয় যে মনুষ্য মধ্যে দৈবাৎ যেমন সংযুক্ত যমজ জন্মগ্রহণ করে, মৎস্য মধ্যেও দৈবাৎ ওরূপ হইয়া থাকিবে। সংযুক্ত যমজ মনুষ্য জীবিত অবস্থায় বহুকাল অবস্থিতি করিয়াছে, এরূপ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই পুস্তকের স্থানান্তরে তাহা সন্নিবেশিত হইয়াছে।

সোর্ড ফিশ বা অসিধারী মৎস্য।

এই মৎস্য দৈর্ঘ্যে ১৫ হইতে ২০ ফুট পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ইহাদের মুখভাগের উপর দিকে এক সুদৃঢ় অস্থিময় অসিবৎ পদার্থ সরলভাবে

উৎপন্ন হইয়া থাকে; তদ্দ্বারা ইহারা অপর মৎস্যকে আক্রমণ করতঃ বিদ্ধ করে এবং ঔদরিকের ন্যায় অতি ব্যগ্রভাবে তাহা ভক্ষণ করিয়া থাকে। ইহারা অতি কোপনস্বভাব; কখন কখন সমুদ্রস্থ অর্ণব-তরীর তলদেশ অত্যন্ত বলপূর্ব্বক বিদ্ধ করে, ইহাতে তাহাদের সমগ্র অসি জাহাজের তলায় প্রবিষ্ট হইয়া যায়; তাহারা উহা আর প্রায় খুলিয়া লইতে পারে না, সুতরাং তাহাতেই সংলগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করে।
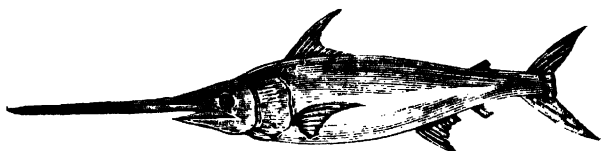
এই যোদ্ধৃ-মৎস্য সম্বন্ধে আশ্চর্য্য বিবরণ শ্রবণ করা যায়। ইংলণ্ডীয় রণ-তরী "ফন্" জীর্ণ হইলে সংস্কারের জন্য যখন সংস্কারকদিগের হস্তে অর্পিত হয় এবং জাহাজ খানিকে ডকের উপর উত্তোলন করা হয়, তখন দেখা যায় যে একটা উক্ত প্রকার মৎস্যের অসি জাহাজের তক্তায় প্রায় এক হস্ত বিদ্ধ হইয়াছে। মৎস্যটা টানাটানি করাতে বোধ হয় অসিটা ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল। উক্ত অসি সমেত তক্তাখানি জাহাজ হইতে খুলিয়া লওয়া হয় এবং সার্জ্জন কলেজের কৌতুকাগারে সংরক্ষিত হয়। অপর এক সময়ে একখানি জাহাজ কলম্বো হইতে ইংলণ্ডে গমন করিতেছিল; পথিমধ্যে উহাতে জল চুয়াইতে আরম্ভ হয়। জাহাজখানি ইংলণ্ডে যাইয়া পুনর্ব্বার কলম্বোয় আগমন করে, এবং তথা হইতে কোচিনে গমন করে; কিন্তু বরাবরই জল চুয়াইতে থাকে। তৎপরে বহুল অনুসন্ধানের পর দেখা যায় যে জাহাজের তলভাগে এক ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট একটী গর্ত্ত কর্ত্তিত হইয়াছে। এই গর্ত্ত মধ্য দিয়া জল চুয়াইত তাহার সন্দেহ নাই। জাহাজের নাবিকগণ প্রথম কলম্বো

হইতে যাত্রা করিবার সময়ে এক অসিধারী মৎস্য বড়িশদ্বারা বিদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু মৎস্যটা বড়িশ ও সূতা লইয়া পলায়ন করে। ইহাতে সকলে অনুমান করিল যে সেই মৎস্যটাই প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া জাহাজখানি বিদ্ধ করিয়াছিল।

শুটিং ফিশ বা বন্দুকধারী মৎস্য।

এই সকল মৎস্য আকৃতিতে বৃহৎ নয়, কিন্তু ইহাদের একটী আশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে। ইহাদের মুখভাগ নলের মত, এই নল মধ্য দিয়া উহারা কিঞ্চিৎ জল আকর্ষণ করিয়া লয় এবং জলোপরি শূন্যভাগে উড্ডীয়মান কোন মক্ষিকাদির প্রতি এরূপ স্থির লক্ষ্য করিয়া জলবিন্দু সবলে নিক্ষেপ করে যে উহা তৎক্ষণাৎ জলে নিপতিত হয়। তখন উহারা ঐ মক্ষিকাদি ধরিয়া ভক্ষণ করে। যদি জলোপরি কোনও জলজ উদ্ভিদ বিশেষের উপর কোন কীট বসিয়া থাকে, তাহা হইলে উহারা পাঁচ কিম্বা ছয় ফুট অন্তরে গমন করে এবং উক্ত কীটের প্রতি এক বিন্দুমাত্র জল এত বল পূর্ব্বক নিক্ষেপ করে যে উহা তৎক্ষণাৎ জলে পতিত হয়। উহাদের এরূপ স্থির লক্ষ্য যে তাহা কখনই ব্যর্থ হয় না। বিশ্বপতির সৃষ্টি-কৌশল যতই আলোচনা করা যায় ততই বিস্ময়রূপ অকূল মহার্ণবে নিমগ্ন হইতে হয়।

বহুরূপী মৎস্য।

এক প্রকার মৎস্য আছে, তাহারা যেরূপ জলে অবস্থিতি করে সেইরূপ বর্ণ ধারণ করিয়া থাকে। কোন কৃষ্ণবর্ণ মৎস্য লইয়া যদি পরিস্কৃত জলে স্থাপন করা যায় তাহা হইলে দুই এক দিনের মধ্যে ধপ-ধপে সাদা হইয়া যাইবে। এবং কোন কৃষ্ণবর্ণ টবের মধ্যে জল ঢালিয়া তাহাতে একটী শুক্লবর্ণ মৎস্য স্থাপিত করিলে প্রথমে যেন জলমধ্যে চক্‌চক্‌ করিয়া দীপ্তি পাইতেছে বলিয়া বোধ হইবে। দুইদিন পরে

দেখিলে প্রথমেই মনে হইবে মৎস্যটা কোথায় গেল। নিপুণভাবে দেখিলে দেখা যাইবে যে মৎস্যটা কৃষ্ণবর্ণ হইয়া টবের গাত্রে অলক্ষ-ভাবে অবস্থিতি করিতেছে। শত্রুদিগের আক্রমণ হইতে আপনাকে গোপন করিবার জন্যই ভগবান্ উহাদিগের ঐ প্রকার প্রকৃতি করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু উহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক বর্ণ পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে কিম্বা স্বতঃই উহাদের ঐ প্রকার বর্ণান্তর লাভ হয় তাহা সম্যক্ অবগত হইতে পারা যায় নাই।

গানকারী মৎস্য।

সিংহলের উত্তরস্থ অরণ্যময় প্রদেশে এক হ্রদ আছে, তাহাতে এরূপ মৎস্য বাস করে যে তাহারা তন্ত্রী-নিনাদ তুল্য সুশ্রাব্য স্বর উচ্চারণ করিয়া থাকে। ইমার্সন্ টেনাণ্ট নামক এক সাহেব উক্ত মৎস্যের গল্প শ্রবণ করিয়া উহা কতদূর সত্য তাহা জানিবার জন্য উক্ত প্রদেশে গমন করেন। সেখানে জালজীবিগণের নিকট এই তত্ত্ব অবগত হন যে, উক্ত প্রকার মৎস্য বা জলজন্তু বিশেষ সত্যই আছে ; তামিল ভাষায় ঐ মৎস্যকে "উরি-কুলুরু ক্রেড়ু" কহিয়া থাকে ; ইহার অর্থ "রোরুদ্যমান মৎস্য"। উক্ত সাহেব একদিন জ্যোৎস্নাময় রাত্রিতে উক্ত হ্রদের উপর নৌকাযোগে ভ্রমণার্থ বহির্গত হইলেন। তখন বায়ু স্থিরভাবে বহিতে-ছিল এবং ক্ষেপণীবিক্ষেপধ্বনি ব্যতীত আর কোন শব্দ শ্রুতিগোচর হয় নাই। যে স্থলে ঐরূপ শব্দ লোকে শ্রবণ করিত তথায় উপস্থিত হইলে তিনি স্পষ্ট বীণাস্বরের মত শব্দ শুনিতে পাইলেন এবং বুঝিলেন যে ঐ শব্দ হ্রদস্থ জলের নিম্নভাগ হইতে উৎপন্ন হইতেছে। তিনি কহিয়াছেন "এই স্বর নানারূপ কোমল অনুচ্চ স্বরে মিলিত হইয়া সমুত্থিত হইতে লাগিল, কিন্তু প্রত্যেক স্বরই পরিষ্কার ও স্পষ্ট শ্রুতিগোচর হইল। বোটের কাষ্ঠময় অবয়বে কর্ণ অর্পণ করিয়া শুনিলাম যে ঐ স্বর আরও

উচ্চতর হইয়া বহির্গত হইতেছে। আমরা ক্রমশঃ যেমন হ্রদোপরি গমন করিতে লাগিলাম, ঐ প্রকার স্বরও সেইরূপ নানাভাবে বহির্গত হইতে লাগিল।” তিনি ঐ স্বর শুনিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে উহা নিশ্চয়ই চিংড়িজাতীয় এক প্রকার মৎস্যের আনন্দধ্বনি। তিনি এডিন্‌বর্গের দার্শনিক সমাজে স্বীয় বিবরণী প্রেরণ করিলে, ডাক্তার গ্রাণ্ট ট্রাইটোনিয়া জাতীয় কতকগুলি মৎস্য একটী সমুদ্র-জলপূর্ণ গ্লাসের মধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক উহা এক টেবিলের উপর সংস্থাপন করিলেন। অনেক লোক কৌতুক দেখিবার জন্য চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইল। যতক্ষণ সেখানে লোক সকল উপস্থিতি ছিল ততক্ষণ তাহারা মধ্যে মধ্যে এইরূপ ধ্বনি শ্রবণ করিতে লাগিল, যেন একটা লৌহময় তার কোন জার বা জালার গাত্রে আহত হইতেছে। এই শব্দ এতদূর উচ্চ হইয়াছিল যে তাহা বার ফুট অন্তর হইতেও শুনা গিয়াছিল।

শীল।

সমুদ্রগর্ভে শীল নামক এক প্রকার জন্তু বাস করিয়া থাকে। ইহাদের আকৃতি ও প্রকৃতি অনেকটা মনুষ্যের ন্যায়। অনেকে কহেন শীল দৃষ্টেই সাগর-নর ও সাগর-নারীর অস্তিত্ব কল্পিত হইয়াছিল। ইহারা নানা জাতীয় আছে, তন্মধ্যে কতকগুলির মুখ কুক্কুরের ন্যায়, কতক-গুলির ভল্লুকের মত এবং অপর কতকগুলির মুখ বন মানুষের মত দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাদের চক্ষুদ্বয় উজ্জ্বল ও দীর্ঘ ; যখন ইহারা জলমধ্যে অর্দ্ধ শরীর রাখিয়া অর্দ্ধ শরীর জলোপরি উত্থাপিত করে, তখন দূর হইতে দেখিলে অনেকটা মানবাকৃতি বলিয়াই বোধ হয়। ইহাদের অবয়ব অতি বৃহৎ হইয়াও থাকে ; কোন কোন শীলমীন ওজনে দশ বার মণ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। সকল প্রকার শীলই স্তন্যপায়ী ও শাবকরূপে প্রসূত হইয়া থাকে।

শীলদিগের স্বভাব এই যে সমুদ্র মধ্যস্থ অথবা সমুদ্র-তীরস্থ পর্ব্বতোপরি দলবদ্ধ হইয়া উত্থিত হয় এবং জল হইতে কিয়দ্দূর অন্তরে একত্র

পাঁচ ছয় ঘণ্টা অবস্থিতি করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে কোন কোন জাতি পুষিলে পোষ মানিয়া থাকে এবং পক্ষীর মত কথা কহিতেও শিখে। একজন একটী শীল পুষিয়াছিল এবং এক জলপূর্ণ বৃহৎ টবের মধ্যে সংস্থাপিত করিয়াছিল। সে "মা", "বাবা" বলিয়া ডাকিতে পারিত এবং ক্ষুধা পাইলে যে পুষিয়াছিল তাহার নাম ধরিয়া "জন্" এই শব্দে ডাকিত। অপর এক ব্যক্তি এক শীল পুষিয়াছিল; তাহাকে "কোকট" এই নামে ডাকিলে উত্তর দিত এবং সে স্বীয় প্রভুর মুখ-চুম্বন করিতে শিখিয়াছিল।

তিমি।

তিমি যে বৃহত্তর সামুদ্রিক জীব তাহা প্রায় সকলেই অবগত আছেন। পৃথিবীতে এমন কোন জীব নাই, যাহা আকৃতি ও বলে তিমির তুল্য হইতে পারে। আমরা হস্তীকে বৃহত্তম জন্তু বলিয়া থাকি, কিন্তু হস্তী অপেক্ষাও তিমি বহুগুণে বৃহত্তর। তিমি যদি নিজের কত বল তাহা

জানিত, তাহা হইলে মনুষ্য উহাদের ধৃত করিবার জন্য যাহা কিছু উপায় অবলম্বন করিত, সে সমস্ত বিফল করিতে পারিত। যাহারা তিমি শিকার করিতে যায় তাহারা বোটে উঠিয়া সমুদ্র মধ্যে গমন করে, এবং কোন তিমি জলোপরি ভাসিয়া উঠিলেই এক তীক্ষ্ণ শলাকাদ্বারা
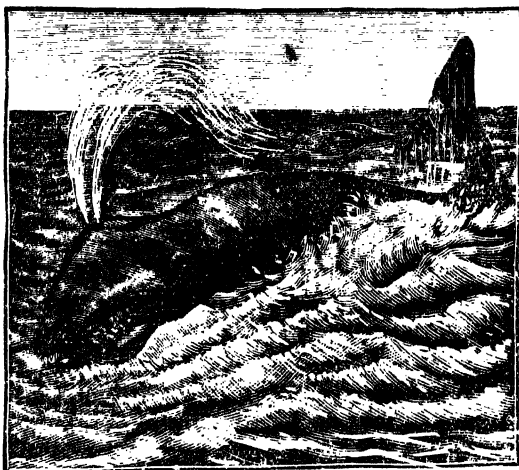
উহাকে বিদ্ধ করে। উক্ত শলাকার সহিত এক সুদৃঢ় রজ্জু সংলগ্ন থাকে। উক্ত রজ্জু অবশ্যই বহুল দীর্ঘ, কিন্তু তিমি শলাকাবিদ্ধ হইয়া সমুদ্রনিম্নে নিমগ্ন না হইয়া যদি সরলভাবে অতি দ্রুত ধাবমান হইত তাহা হইলে অতি কঠিন রজ্জুও বিচ্ছিন্ন করিতে পারিত। কিন্তু শলাকাবিদ্ধ হইলে তিমি মনে করে কোন হাঙ্গরাদি জীব আসিয়া দংশন করিল; এই ভাবিয়া সে পরিত্রাণ পাইবার আশায় জলমধ্যে নিমগ্ন হয়। তিমিগণ জলের যত নিম্নে গমন করিতে পারে অপর কোন জলজন্তু তত নিম্নে যাইতে পারে না। যেহেতু, তিমি যত জলভার সহ্য করিতে পারে

অপর কোন জীব তত ভার সহ্য করিতে পারে না; তাহাতে আবার তিমির শ্বাসপ্রশ্বাসের যন্ত্র না থাকায় বায়ু গ্রহণের তত প্রয়োজন হয় না। শলাকা-বিদ্ধ তিমি জলের বহুল নিম্নভাগে গমন করিয়া আবার ভাসিয়া উঠে, এবং পুনর্ব্বার জলমগ্ন হইতে আরম্ভ করে। বারম্বার এইরূপ করিতে করিতে ইহাদের বলক্ষয় হয়; তখন উহা মনুষ্যের করায়ত্ত হইয়া পড়ে। অতএব দেখ এমন ভীষণ সামুদ্রিক জীবকেও মনুষ্য স্ববশে আনয়ন করে।

এক্ষণে আমরা তিমির বলের কিছু পরিচয় দিতেছি। একশত ফুট জলের নীচে প্রতি বর্গ ইঞ্চ পরিমিত স্থানে জলের ভার ২৯ সের। ৪০০০ ফুট নিম্নে জলের ভার প্রতি বর্গ ইঞ্চ স্থানে প্রায় ২৩ মন। চারি সহস্র ফুট কিছু অধিক গভীর নহে। তিমি তাহা অপেক্ষাও অনেক নীচে নিমগ্ন হইতে পারে। অতএব বিবেচনা কর সুবৃহৎ তিমি-শরীরে কত ভার পতিত হওয়া সম্ভব। সমুদ্র মধ্যে যখন কোন জাহাজ নিমগ্ন হয়, তখন তাহা বহু নিম্নে গমন করিলে উপরিস্থ জলভারে উহার প্রত্যেক তক্তা খুলিয়া যায় কিন্তু একখানি তক্তাও সে জলভার ভেদ করিয়া উপরে উঠিতে পারে না। তিমি শলাকা-বিদ্ধ হইবামাত্র শলাকা ও তৎসংলগ্ন রজ্জু লইয়া অতি প্রবলবেগে জলনিমগ্ন হইতে থাকে। দীর্ঘরজ্জু বোটের উপর কুণ্ডলীকৃত হইয়া থাকে; তাহা এরূপ বেগে বোটের পার্শ্ব দিয়া অবতীর্ণ হয় যে, তাহার ঘর্ষণে অগ্নি উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা। এই অনর্থ নিবারণ করিবার জন্য একজন লোক নিয়ত ঘৃষ্ট স্থানে জলসেচন করে এবং অপর এক ব্যক্তি কুঠার হস্তে দণ্ডায়মান থাকে, কারণ যদি অগ্নি উৎপন্ন হয় তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ রজ্জু কর্ত্তন করিয়া দিবে।

ডগঙ্গ্।

জলচর জীবসমূহ মধ্যে অধিকাংশই অণ্ড প্রসব করিয়া থাকে ; কিন্তু উহাদের মধ্যে এরূপ জীবও আছে, যে তাহারা অণ্ড প্রসব না করিয়া

শাবক প্রসব করে ও স্তন-দুগ্ধ দ্বারা উহাদিগকে পোষণ করে। শঙ্কর মৎস্য, তিমি. ডগঙ্গ্, ম্যানাটি প্রভৃতি জলজন্তুগণ স্তন্যপায়ি-জীবের অন্তর্গত। ডগঙ্গ্ বলিয়া যে জীব সমুদ্রমধ্যে বাস করে, তাহাদের স্তনদ্বয় বক্ষঃস্থলে এরূপ বৃদ্ধি পায় যে নারীর স্তনতুল্য দৃষ্টিগোচর হয়। ইহারা সন্তান বক্ষে করিয়া কখন কখন জলোপরি অর্দ্ধ শরীর উত্তোলন করিয়া থাকে। তখন ইহাদিগকে প্রায় মনুষ্যের মত দেখায়। অনেকেই বলেন যে নাবিকগণ এইরূপ প্রাণী দৃষ্টি করিয়া লোক মধ্যে অতিরঞ্জিত বর্ণনা করায় সাগরনারীর অস্তিত্ব পরিকল্পিত হইয়াছে।

ম্যানাটি।

ম্যানাটি ঐ জাতীয় জীব ; উহারা সচরাচর নদীমধ্যে বাস করিয়া থাকে। ডগঙ্গ্ ও ম্যানাটির আকৃতিতে কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা আছে।

তাহা সত্ত্বেও উক্ত উভয় জীবই দূর হইতে দেখিলে অনেকটা মনুষ্যের মতই বোধ হয়। ম্যানাটির মাংস অত্যন্ত উপাদেয় বিবেচিত হইয়া থাকে। তিমির মাংস রক্তবর্ণ কিন্তু ম্যানাটির মাংস সাদা, অনেকটা বসার মত আকৃতি। দক্ষিণ আমেরিকার নদী সমূহে ইহারা বহুল

পরিমাণে বাস করে। তদ্দেশীয়গণ মৎস্য বিবেচনায়, যেদিন মাংস ভোজন নিষিদ্ধ, সে দিনেও উহাদিগকে ভক্ষণ করিয়া থাকে। কখন কখন একটা ম্যানাটি ধরিবার জন্য শিকারীরা বহুল পরিশ্রম স্বীকার

পূর্ব্বক কয়েকদিন অতিবাহিত করে এবং ধরিতে পারিলে মহানন্দে তৎক্ষণাৎ খণ্ড খণ্ড করতঃ অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ভক্ষণ করে। ইহার দুগ্ধও সুমিষ্ট ও পুষ্টিকর। ইহাদের চর্ম্ম অত্যন্ত দৃঢ় হয়, এইজন্য উহা বহু মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। ডগঙ্ ও ম্যানাটির তৈল অত্যন্ত পুষ্টিকর; এইজন্য ঐ সকল জীবগণকে ক্রমাগত ধৃত করায় উহাদের সংখ্যা দিন দিন ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। কালক্রমে বোধ হয় উহাদের অস্তিত্ব আর থাকিবে না।

পাদ-শিরস্ক জীব।

ক্যালামারি, কটল্ ও অক্টোপাস্।

অতি প্রাচীন কাল হইতে এই কিম্বদন্তী আছে যে, মহাসমুদ্রের অভ্যন্তরে ভয়ানকাকৃতি রাক্ষস বাস করিয়া থাকে। এ সম্বন্ধে ইয়ুরোপের উত্তরাংশে নানাবিধ অদ্ভুত উপন্যাস প্রচলিত আছে। কথিত আছে যে ঐ সকল সামুদ্রিক রাক্ষস যখন উপরিভাগে উঠিয়া ভাসিয়া যায়, তখন বোধ হয় যেন একখানি দ্বীপ ভাসিয়া যাইতেছে; কখন কখন মৎস্যজীবিগণ নৌকাযোগে সমুদ্র মধ্যে গমন করিয়া কোন ভাসমান সামুদ্রিক রাক্ষসকে দ্বীপ মনে করিয়া থাকে; এবং তাহারা হয়তো উহার উপর উঠিয়া রন্ধনার্থ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিলে, হঠাৎ ঐ জন্তু জলমধ্যে নিমগ্ন হয় এবং মৎস্যজীবিগণ নিরাশ্রয় হইয়া জলমধ্যে হাবুডুবু খাইতে থাকে।

এই ভয়ানক জীবকে "ক্রাকেন্" কহিত, কিন্তু বর্ত্তমানকালে কোন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতই উহার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, উহা কেবল মূর্খ জালজীবিদিগের অতিরঞ্জিত বর্ণনা মাত্র। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের বলে এ পর্য্যন্ত স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, সামুদ্রিক রাক্ষস বলিয়া যদি কোন জীব থাকে তাহা হইলে উহা ক্যালামারি, কটল্ ও

অক্টোপাস্। এই তিন জাতীয় সামুদ্রিক হিংস্র প্রাণী আকৃতি ও প্রকৃতিতে প্রায় পরস্পর সমান। কুম্ভীর, হাঙ্গর ও সামুদ্রিক ভীষণ সর্পও হিংস্র জীব বটে, কিন্তু উক্ত ত্রিবিধ প্রাণী আকারে যত বৃহৎ, শেষোক্ত জীবগণ সেরূপ নহে। তিমিই এক্ষণে সর্ব্ব বৃহৎ জীব, কিন্তু উহারা হিংসাবৃত্তি সম্বন্ধে ঐ সকল হিংস্র জীব অপেক্ষা অনেক ন্যূন।

কতকগুলি সামুদ্রিক জীব আছে, তাহারা আকারে কতকটা চিংড়ি মৎস্য ও কর্কটের মাঝামাঝি। অর্থাৎ তাহাদের কতকগুলি করিয়া পা বা হাত আছে এবং তাহারা সকলেই চলিবার সময় লাঙ্গুলের দিক অগ্রে বাড়াইয়া দিয়া চলিয়া থাকে, এই জন্য ইহাদিগকে পাদশিরস্ক বলা যায়। পূর্ব্বোক্ত ক্যালামারি, কটল্ ও অক্টোপাস্ নামক জীব এই শ্রেণীর মধ্যে, কিন্তু আকার অত্যন্ত বৃহৎ। "ক্যালামারি" ইহাকে বাঙ্গালায় "কেরাণী মৎস্য" বলা যাইতে পারে, কারণ ইহার অঙ্গে পেন কলমের মত কতক গুলি করিয়া পদার্থ জন্মায় এবং ইহারা গমন কালে কোনরূপ ভয় পাইলে মসীর মত গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ এক প্রকার রস গাত্র হইতে নির্গত করিয়া থাকে। যেমন গন্ধগোকুলের গাত্র হইতে এক প্রকার সুগন্ধ বাহির হয়, সেইরূপ উক্ত কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ হইতে এক প্রকার সুগন্ধ বাহির হইয়া থাকে। ইহারা হাঙ্গর, কুম্ভীর বা সর্পের মত নির্ভীক নহে, হাঙ্গরাদির ভয়ে ইহারা পলায়ন করিয়াও থাকে।

ক্যালামারি ও কট্‌ল্ দূর সমুদ্রে থাকে ; ইহাদের আটখানি করিয়া বাহু ও দুইখানি করিয়া দীর্ঘ শুণ্ডবৎ পদার্থ থাকে। এই শুণ্ডবৎ পদার্থ বাড়াইয়া দিয়া উহারা অপর জলজন্তুগণকে আক্রমণ করে এবং টানিয়া লইয়া বাহুসমূহদ্বারা জড়াইয়া ধরে। তৎপরে উহারা ক্রমে ক্রমে উহা ভক্ষণ করিতে থাকে। উক্ত শুণ্ড পরিমাণ ২০।৩০ হস্ত পর্য্যন্ত দীর্ঘ হইয়া থাকে এবং বাহুগুলি ৮।১০ হস্ত পর্য্যন্ত দীর্ঘ হয়। উহা অপেক্ষাও দীর্ঘ হওয়া অসম্ভব নয়। প্রামাণিক বিবরণ পাঠে

অবগত হাওয়া যায়, যে উহারা কখন কখন বোটের উপরিস্থিত মনুষ্য-

গণকে স্বীয় শুণ্ড বা বাহুদ্বারা আকর্ষণ করত জলমধ্যে লইয়া যায়। তাহারা এই কার্য্য নিমেষ মধ্যে সম্পন্ন করিয়া থাকে।
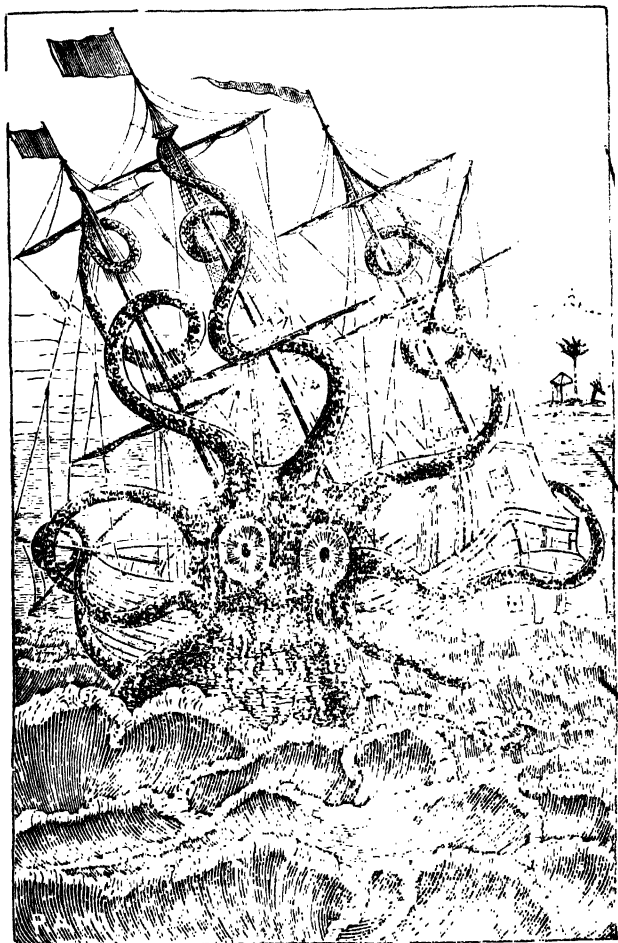
ডেনিস্ ডি মণ্টর্ফোর্ট নামক এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন যে, এক সময়ে এক বৃহৎ কটল্ বা ক্যালামারি এক তিন মাস্তুলযুক্ত বড় জাহাজের মাস্তুল ও দুই মুখ স্বীয় বাহু সমূহ দ্বারা এরূপ জড়াইয়া ধরিয়াছিল যে জাহাজখানি জলমগ্ন হইবার উপক্রম হয়। নাবিকগণ উপস্থিত বুদ্ধির বলে উক্ত বাহু সমূহকে তৎক্ষণাৎ ছেদন করিয়া দেয়; ইহাতেই জাহাজখানি উপস্থিত বিপদ হইতে রক্ষা পায়। পূর্ব্ব পৃষ্ঠার চিত্রে দৃষ্টিপাত কর, দেখ কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার!

কিন্তু অতবড় জীব আর কখন অন্য কাহারও দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই; ইহাতে অনেকে অনুমান করেন, উক্তরূপ বর্ণনা অতিরঞ্জিত মাত্র। আমরা বলি অতিরঞ্জিত না ও হইতে পারে; পরমেশ্বর সমুদ্রমধ্যে যে কত প্রকার অদ্ভুত জীব সৃষ্টি করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন, তাহার নির্ণয় করিবার সামর্থ্য কাহার আছে? যখন আমরা নিজে স্থলের জীব হইয়াও স্থলচর বহুল জীবের সন্ধান প্রাপ্ত হইতে পারি না, তখন মহাসমুদ্রমধ্যে চক্ষুর অগোচর জীবসমূহের সম্যক সন্ধান কি প্রকারে লাভ করিব?

অক্টোপাস।

অক্টোপাস্ নামক পাদশিরস্ক জীব দূর সমুদ্রে বাস করে না; ইহারা তীরবর্ত্তী স্থানে, পর্ব্বতময় কূলে প্রায়ই বাস করে। ভূমধ্যসাগরে ইহারা প্রচুর পরিমাণে থাকে। ইহাদের আটখানি ভুজ ব্যতীত অপর দীর্ঘ শুণ্ড থাকে না। যাহারা সমুদ্রজলে স্নানার্থ অবতীর্ণ হয়, তাহারা অক্টোপাস্ কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও নিমগ্ন হইতে পারে। এরূপ ঘটনা অনেকবার ঘটিয়াছে। "অক্টোপাস্" এই কথাটী বাঙ্গলায় অনুবাদ করিলে "অষ্টপদ" এই নাম দেওয়া যায়? এই "অষ্টপদ" সমূহের মধ্যে আশ্চর্য্য এই যে ইহাদের ভুজগুলির মধ্যে কোনটী বা সকলগুলি ছেদন করিয়া দিলে, তাহা আবার গজাইয়া থাকে এবং কিছুকাল মধ্যে পূর্ব্বরূপ হয়।

ইহাদের ভুজ প্রায় ৪।৫ হাত দীর্ঘ হইয়া থাকে। অনেক দেশীয় লোক
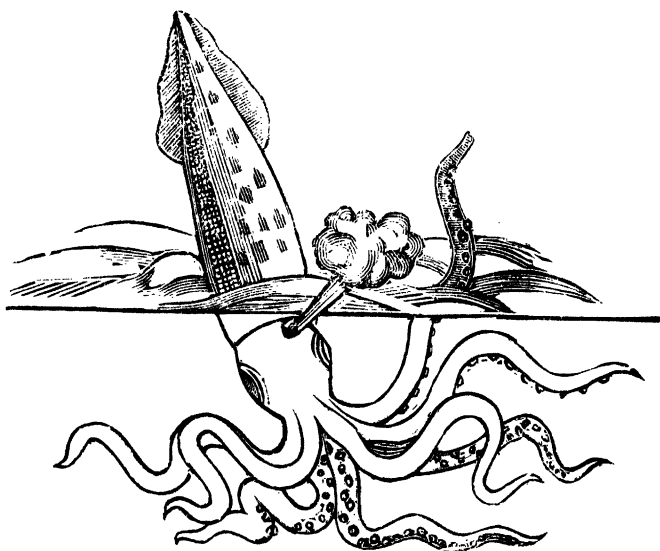
এই সকল জীবকে রন্ধন করিয়া ভক্ষণ করিয়া থাকে; তাহারা ইহাকে সুস্বাদু, সহজপাচ্য ও পুষ্টিকর কহিয়া থাকে।

নটিলাস বা নাবিক-শম্বুক।

অতি পূর্ব্বকাল হইতে প্রাণিগণের ইতিবৃত্তে কথিত আছে যে, সমুদ্রগর্ভে শম্বুক বা শঙ্খ জাতীয় এমন এক প্রকার জীব আছে যে তাহারা স্বীয় শরীরাবরণকে নৌকাস্বরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহাদের আবরণ বা খোলা পাতলা ও বোটের মত আকৃতি বিশিষ্ট। উক্ত প্রাণিগণ যখন সমুদ্রের তলদেশে অবস্থিতি করে তখন গতিশূন্য জড়পিণ্ডের মত থাকে। কিন্তু ঝটিকা পরিশূন্য ধীর সমুদ্রে ইহারা প্রায়ই জলের উপরিভাগে ভাসিয়া উঠে। তখন স্বীয় আবরণ হইতে দুইখানি প্রশস্ত

ও চেপ্‌টা হস্ত বহির্গত করিয়া শূন্যোপরি উন্নত করিয়া থাকে। ঐ দুইখানি হস্ত অতি সূক্ষ্ম জালবৎ পদার্থে গঠিত হওয়ায় পাইলের কার্য্য
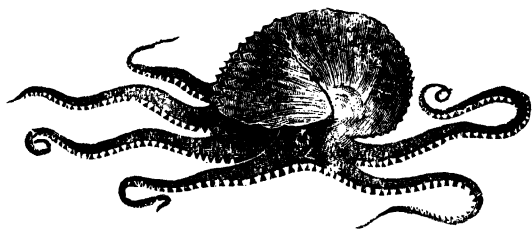
করিয়া থাকে। ক্রমে স্বীয় কলেবর উক্ত আবরণের মুখ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং তখন উহারা অপর বাহু সমূহ দ্বারা, দাঁড় বাহিয়া যাইবার মত,
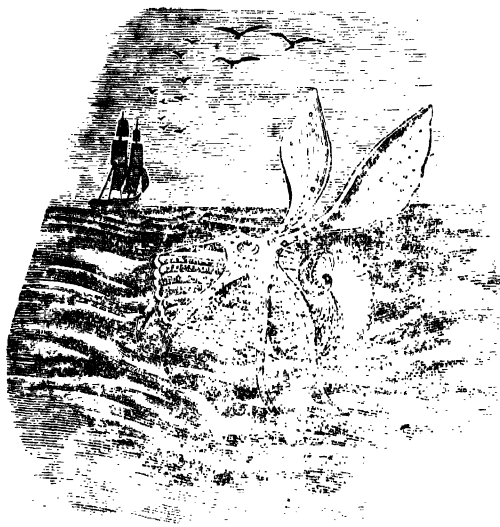
জলোপরি গমন করিতে থাকে। যদি ঝটিকা বা অপর ভয়ের কারণ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে উহারা ক্রমে ক্রমে পাইলের স্বরূপ উন্নত বাহুদ্বয়

গুটাইয়া লয়; ক্রমে বাহুসমূহের সহিত স্বীয় কলেবর উক্ত নৌকাবৎ আবরণ-খোলার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেয়; তখন উহার মধ্যে জল উঠিয়া তাহা পরিপূর্ণ হইয়া গেলে ক্রমে মগ্ন হইতে আরম্ভ হয়; পরিশেষে সমুদ্রতলে নিঃশঙ্কভাবে পুনরায় অবস্থিতি করিতে থাকে।

অতি পূর্ব্বকালে এরিষ্টটল্ প্রভৃতি বিখ্যাত পণ্ডিতগণ উক্তরূপ নাবিক-শম্বুকের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমানকালেও বহুলোকে ঐ প্রকার জীব সম্বন্ধে অবিশ্বাস করেন না। কিন্তু আধুনিক প্রাণিতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ অনেক অনুসন্ধান করিয়াও উক্ত প্রকার জীব দেখিতে পান নাই; এইজন্য তাঁহারা কহেন যে "পত্র শম্বুক" (paper nautilus) এবং "মৌক্তিক শম্বুক" (pearly nautilus) নামক প্রাণিদিগকেই
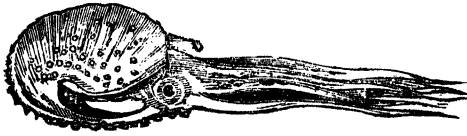
লোকে ভ্রমক্রমে "নাবিক-শম্বুক" (sailing nautilus) কহিত; কারণ এই দুই প্রকার শম্বুক জলের নীচে গড়াইয়া গড়াইয়া চলিতে পারে এবং জলোপরি সন্তরণ প্রদান করিতেও পারে।

সামুদ্রিক সর্প।

সামুদ্রিক সর্প সম্বন্ধে প্রাণিতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ এই প্রকার বর্ণনা করিয়া থাকেন, "ভারত মহাসাগরে সামুদ্রিক সর্প বহুল পরিমাণে দেখা যায়; পৃথিবীর অপরাপর স্থানের সমুদ্রেও ইহারা দুষ্প্রাপ্য নহে। ইহারা ৪০ বা ৫০ জাতিতে বিভক্ত ও সকলেই ভয়ঙ্কর বিষ ধারণ করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি মনুষ্য দেখিলে বেগে গিয়া আক্রমণ করে, অপর কতকগুলি মনুষ্য দেখিলে পলায়ন করিবার চেষ্টা করে। ইহাদের দৈর্ঘ্য ১২ ফুট পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। স্থলচর সর্প অপেক্ষা ইহাদের

আকৃতিতে একটু বিভিন্নতা আছে। জলে স্বাধীনভাবে সন্তরণ করিবে বলিয়া পরমেশ্বর উহাদের লাঙ্গুলের দিক্ ক্রমশঃ চেপ্টা করিয়া দিয়াছেন এবং অগ্রভাগ ক্রমশঃ সূক্ষ্ম না করিয়া কাগজ কাটা ছুরির অগ্রভাগ যেমন গোল হইয়া থাকে, সেইরূপ করিয়া দিয়াছেন। ইহাদের শ্বাস প্রশ্বাসের যন্ত্র আছে এবং প্রয়োজনানুরূপ ফুস্‌ফুস্ যন্ত্রও গঠিত হইয়াছে।”

এইতো গেল বৈজ্ঞানিকদিগের কথা, কিন্তু বহুল সর্পের আকৃতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে যে সমস্ত বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা শুনিলে নিশ্চয়ই বিস্মিত ও চমৎকৃত হইতে হয়। ঐ সকল বিবরণের মধ্যে কতকগুলি অতিরঞ্জিত হইতে পারে; কিন্তু এমন কোন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত নাই যিনি সমুদ্রস্থ সমস্ত সর্পের তত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছি বলিয়া গর্ব্ব করিতে পারেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, অদৃশ্য সমুদ্র-গর্ভে কতই অদৃশ্য জীব থাকিতে পারে। সে সমস্ত এখনও মনুষ্য দৃষ্টির সম্পূর্ণ অন্তর্ভূত হইতে পারে নাই। নিম্নে কতকগুলি বর্ণনা সংগ্রহ করা গেল, তদ্দৃষ্টে সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন সন্দেহ নাই।

সুইডেনের সর্ব্ব প্রধান ধর্ম্মযাজক ওলাস্‌ম্যাগনাস্ ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে লিখিয়াছেন যে, যাহারা নরওয়ের উপকূলে বাণিজ্য করে বা মৎস্য ধরিয়া থাকে তাহারা সকলেই নিম্নলিখিত বর্ণনায় একমত প্রকাশ করে। তাহারা কহে, এক বিপরীতাকার ভয়ঙ্কর সর্প সমুদ্রতীরবর্ত্তী পর্ব্বত মধ্যে বাস করিয়া থাকে। ইহার দৈর্ঘ্য ২০০ ফুট এবং স্থূলত্ব ২০ ফুটেরও অধিক। গ্রীষ্মকালীন নির্ম্মল রজনীতে ইহা স্বীয় গহ্বর হইতে একাকী বহির্গত হয়, এবং গোবৎস, মেষশাবক, শূকর ও অন্যান্য জীব সমূহ গ্রাস করিয়া থাকে। কখন কখন সমুদ্র মধ্যে গমন করিয়া সামুদ্রিক কর্কট, অক্টোপাস্ প্রভৃতি ভক্ষণ করিয়া থাকে। সে কখন কখন হঠাৎ জলমধ্যে স্তম্ভের ন্যায় উত্থিত হয় ও জাহাজের উপর হইতে মনুষ্যকে মুখে ধারণ করতঃ জলমধ্যে প্রবেশ করে।”

কাপ্তেন লরেন্স্ ডিফেরি লিখিয়াছেন, "১৭৪৬ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে আমি যখন সমুদ্র যাত্রা করিয়াছিলাম, তখন একদিন আমি পুস্তক

সামুদ্রিক সর্প।

পাঠ করিতেছি এমন সময় নাবিকগণের মধ্যে এক কোলাহল উত্থিত হইল। চাহিয়া দেখিলাম কর্ণধার আমার বোট ফিরাইয়া অপরদিকে লইয়া যাইতেছে। আমি ব্যাপার কি জানিবার জন্য জিজ্ঞাসা করায়,

তাহারা কহিল যে, আমাদের সম্মুখভাগে এক ভয়ানক সামুদ্রিক সর্প রহিয়াছে। আমি পুনরায় সেইদিকে নৌকা ফিরাইয়া যাইতে কহিলাম, কারণ আমার উহা দেখিবার জন্য বিশেষ কৌতুহল জন্মিয়াছিল। নৌকাবাহিগণ যদিও ভীত হইয়াছিল তথাপি আমার আজ্ঞা অবহেলা করিল না। ইতিমধ্যে সর্পটা আমাদের পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেল এবং তাহার আরও নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলাম সর্পটা অতি বেগে গমন করিতেছে। আমার বন্দুকে গুলি পোরা ছিল; তৎক্ষণাৎ উহার প্রতি গুলি ছুড়িলাম। সর্পটা তৎক্ষণাৎ জলমগ্ন হইল এবং জলের উপরিভাগ ঘন ও রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। ইহাতে আমি স্থির করিলাম উহার গাত্রে গুলি লাগিয়াছে। আমি মনে করিয়াছিলাম সর্পটা পুনর্ব্বার ভাসিয়া উঠিবে, কিন্তু তাহা উঠিল না। সর্পটার মুখভাগের খানিকটা আমি দেখিতে পাইয়াছিলাম; উহা যেন অশ্বের মুখের মত। মুখ সম্পূর্ণ কৃষ্ণবর্ণ ও চক্ষুদ্বয় বৃহৎ ও কৃষ্ণবর্ণ; গলদেশে কতকগুলি কেশর ঝুলিতেছে। মস্তক ও গলদেশ ব্যতীত উহার অবয়বের সাত বা আটটী অংশ জলের উপর যেন তরঙ্গায়িত ভাবে চলিতেছে এইরূপ দর্শন করিয়াছিলাম।”

রেভারেণ্ড হান্স্ ইজিড্ নামক গ্রীনল্যাণ্ড্স্থিত, এক বিখ্যাত ধর্ম্মযাজক তদীয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, “১৭৩৪ খৃষ্টাব্দের, ৬ই জুলাই এক ভয়ানকাকৃতি সামুদ্রিক সর্প জল হইতে মস্তক এতদূর উন্নত করিয়া উঠিল যে আমাদের প্রধান মাস্তুলের অগ্রভাগ অতিক্রম করিয়া উঠিল। মুখভাগ ক্রমশঃ সরু ও তাহা হইতে ফুৎকার দ্বারা পিচকারির মত জল বাহির করিতে লাগিল। ইহার পক্ষ বা ডানা প্রশস্ত। সমস্ত অবয়ব শল্কাচ্ছাদিত; ইহার চর্ম্ম সঙ্কুচিত ও বন্ধুর এবং নিম্নাংশ সর্পাকৃতির ন্যায়। কিয়ৎক্ষণ পরে ঐ প্রাণী পশ্চাৎভাগে হেলিয়া জলে নিমগ্ন হইল এবং ইহার লাঙ্গুলাগ্রভাগ জলের উপর উন্নত করিয়া তুলিল। মস্তক হইতে লাঙ্গুলাগ্রভাগ পর্য্যন্ত দৈর্ঘ্যে ঠিক যেন একখানি জাহাজের মত।”

স্পঞ্জ্।

অনেকেই স্পঞ্জ অর্থাৎ জল-শোষক ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহা তুলার মত কোমল অথচ সহজে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। ইহার

গাত্রে মধুমক্ষিকার মধুক্রমতুল্য অসংখ্য ছিদ্র আছে। স্পঞ্জ জলে ফেলিবামাত্র উহা জলশোষণ করিয়া লয়, আবার মর্দ্দিত করিলে জল

বাহির হইয়া যায়। উহার উক্ত প্রকার গুণ থাকাতে নানা ব্যবহারে লাগিয়া থাকে। যে সকল বালকের শয্যামূত্র রোগ আছে, কৌশল পূর্ব্বক স্পঞ্জ ব্যবহার করিলে সমস্ত মূত্র স্পঞ্জে শুষিয়া যায়, শয্যায় তাহা আর পতিত হয় না। অনেক সভ্যসমাজে কোন মিটিং, সভা অথবা থিয়েটার প্রভৃতি স্থানে যাইবার সময় অনেকে বস্ত্রমধ্যে স্পঞ্জ লইয়া গমন করেন। মূত্রবেগ উপস্থিত হইলে আর উঠিয়া যাইতে হয় না। আরও নানা কার্য্যে উহা ব্যবহৃত হয়, তন্মধ্যে বেদনাযুক্ত স্থানে সেক বা ফোমেণ্ট করিতে ইহা সর্ব্বদাই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

এই প্রকার আশ্চর্য্য গুণসম্পন্ন পদার্থ এক প্রকার সামুদ্রিক জীবের কঙ্কালমাত্র। পূর্ব্বে লোকে এই জীবকে উদ্ভিদ্ মনে করিত, কারণ ইহারা প্রবালের ন্যায় এক স্থানে সংলগ্ন হইয়াই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে এবং সেই স্থানেই মৃত হয়। আধুনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ যেমন প্রবাল কীটকে প্রাণি বিশেষ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, সেইরূপ স্পঞ্জকেও প্রাণিবিশেষ বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। এই আশ্চর্য্য জীব লবণাক্ত সমুদ্রেই বহুল পরিমাণে জন্মিয়া থাকে; কোথাও কোথাও নদী মধ্যেও জন্মাইতে দেখা যায়। ইহাদের নানাজাতি আছে তন্মধ্যে যাহা উৎকৃষ্ট তাহা ভূমধ্যসাগর, ভারতমহাসাগর এবং আমেরিকার নিকটবর্ত্তী মহা সমুদ্রে গভীর জলমধ্যে বাস করিয়া থাকে। সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট জাতীয় স্পঞ্জ ডুবারিদ্বারা উত্তোলন করাইতে হয়। ইহারা যেস্থানে প্রথম সংলগ্ন হয় তাহা আর পরিত্যাগ করে না। এক সময় এক বৃহৎ কর্কট ধৃত হইলে দেখা যায় যে একবৃহৎ স্পঞ্জ তাহার পৃষ্ঠভাগে সংলগ্ন রহিয়াছে। এই জীবের নানাপ্রকার আকৃতি হয়। কখন উদ্ভিদের মত, কখন গোলাকার, কখন বা বাটির মত আকার দেখা যায়। কোন কোন জাতীয় স্পঞ্জ ডিম্ব হইতে উৎপন্ন হয়, অপর কতকগুলি অন্য স্পঞ্জের গাত্রে মুকুলের ন্যায় প্রথম উৎপন্ন হয়, তৎপরে স্খলিত হইয়া স্বতন্ত্র স্পঞ্জ হয়।

মুক্তা।

অনেকেই অবগত আছেন, মুক্তা একপ্রকার শুক্তি বা ঝিণুকের মধ্যে জন্মিয়া থাকে। এই সকল মুক্তাশুক্তি পৃথিবীর নানাস্থানে অগভীর সমুদ্রতলে প্রাপ্ত হওয়া যায়। সিংহলদ্বীপের সমীপবর্ত্তী সমুদ্রে, আমেরিকার ওয়েষ্ট্ ইণ্ডিজ নামক দ্বীপ সমূহের নিকটবর্ত্তী সমুদ্রে এবং চীন সাগরে বহুল পরিমাণ মুক্তা প্রাপ্ত হওয়া যায়। মুক্তাশুক্তি সমূহ যখন জলমধ্যে অবস্থিতি করত ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করে, তখন বালুকাকণা প্রভৃতি উহাদের মাংসলভাগে প্রবিষ্ট হইলে উহারা তজ্জন্য ক্লেশানুভব করিয়া থাকে। প্রাকৃতিক নিয়মে উহারা স্বগাত্র নিঃসৃত ক্যাল্‌কেরিয়া নামক রসে উক্ত বালুকাকণাদিকে আচ্ছাদন করিতে থাকে। ঐ রস কঠিন হইলেই মুক্তাকার ধারণ করে। চীন দেশীয় মুক্তাব্যবসায়িগণ কৃত্রিম উপায়ে মুক্তা উৎপাদন করে। তাহারা শুক্তি সমূহ ধৃত করিয়া তাহার মধ্যভাগে গোলাকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তাম্রাদি নির্ম্মিত পদার্থ উহাদের ভিতর প্রবিষ্ট করাইয়া ছাড়িয়া দেয়; কখন কখন তাহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তাম্রনির্ম্মিত বুদ্ধ প্রতিমূর্ত্তি অথবা অপর কোনরূপ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া উক্তরূপে শুক্তিমধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া থাকে। ইহাতে অচিরে ঐ সকল পদার্থ মৌক্তিক পদার্থে পরিবেষ্টিত হইয়া উজ্জ্বলাকার ধারণ করে। কলিকাতার মিউজিয়ম্ নামক কৌতুকাগারে উক্তরূপ এক বুদ্ধ প্রতিমূর্ত্তি রক্ষিত হইয়াছে।

মুক্তা অকিঞ্চিৎকর পদার্থ হইলেও এক একটী মুক্তার মূল্য শ্রবণ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। রোমীয় সম্রাট্ জুলিয়াস্ সিজার তদীয় বন্ধু মার্কাস্ ব্রুটাসের মাতাকে যে একটী মুক্তা উপহার দিয়াছিলেন, তাহার মূল্য প্রায় ৪৬১১২ গিনি। স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ্ একটী মুক্তা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; ইহার মূল্য প্রায় ২৮৫৭১ গিনি। এই মুক্তাটী আমেরিকার ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ সমুদ্র হইতে উত্তোলিত হইয়াছিল।

আমেরিকার আদিম অধিবাসীরা মুক্তার মালা ধারণ করিত; কিন্তু উহা যে বহুমূল্য তাহা জানিতে না। কলম্বস্ যখন আমেরিকায় প্রথম গমন করিয়া উহা আবিষ্কার করেন, তখন তদীয় জাহাজের একজন নাবিক একখানি ভগ্ন চীনের বাসন প্রদান করায় একটী আমেরিকাবাসিনী স্ত্রীলোক উহাকে চারিছড়া মুক্তার মালা প্রদান করিয়াছিল। নানাবিধ কৃত্রিম উপায়ে মুক্তা নির্ম্মাণ হয়, তন্মধ্যে একটী উপায় এই যে এক প্রকার মৎস্যের শল্ক হইতে বহুল পরিমাণ ক্যালকেরিয়া চূর্ণ প্রাপ্ত হওয়া যায়; সেই চূর্ণ কৌশল পূর্ব্বক অপর পদার্থে মাখাইলে মুক্তার ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া থাকে। এইরূপ কৃত্রিম মুক্তা প্রস্তুত করিবার জন্য যে শল্কের আবশ্যকতা হয়, তাহার ব্যবসায়ার্থও বহুল লোক নিযুক্ত আছে।

যে উপায়ে শুক্তিসমূহ সমুদ্রগর্ভ হইতে উত্তোলিত হয়, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে। যাহারা মুক্তা তুলিবার জন্য ডুবারির কার্য্য করে তাহারা শৈশবকাল হইতে জলচর প্রাণীর ন্যায় জলে বাস করিয়া এক প্রকার অভ্যাস করিয়া ফেলে। যাহারা ভাল ডুবারি তাহারা দুই মিনিট হইতে পাঁচ মিনিট পর্য্যন্ত জলমগ্ন থাকিতে পারে। কেহ কেহ আরও অধিকক্ষণ জলমগ্ন থাকিতে সমর্থ হয়। এই সকল ডুবারিরা মুক্তাব্যবসায়ীদিগের সহিত মুক্তার ভাগে অথবা নির্দ্ধারিত বেতনে মুক্তা উত্তোলন করিতে প্রবৃত্ত হয়। সিংহলে যাহারা মুক্তা উত্তোলন করে, তাহারা দলবদ্ধ হইয়া বোটে আরোহণপূর্ব্বক সমুদ্রবক্ষে গমন করে। প্রত্যেক বোটে কুড়িজন করিয়া লোক থাকে, তন্মধ্যে দশজন নৌকাবাহক ও দশজন ডুবারি। ডুবারিরা একে একে জলে ডুবিতে আরম্ভ করে এবং প্রত্যেক বারেই যে বহুল মুক্তা উত্তোলন করিতে পারে তাহা নহে। কোন বারে বেশ লাভ হইল, কোন বার সামান্য, কোন বার বা কিছুই হইল না, এইরূপ হইয়া থাকে।
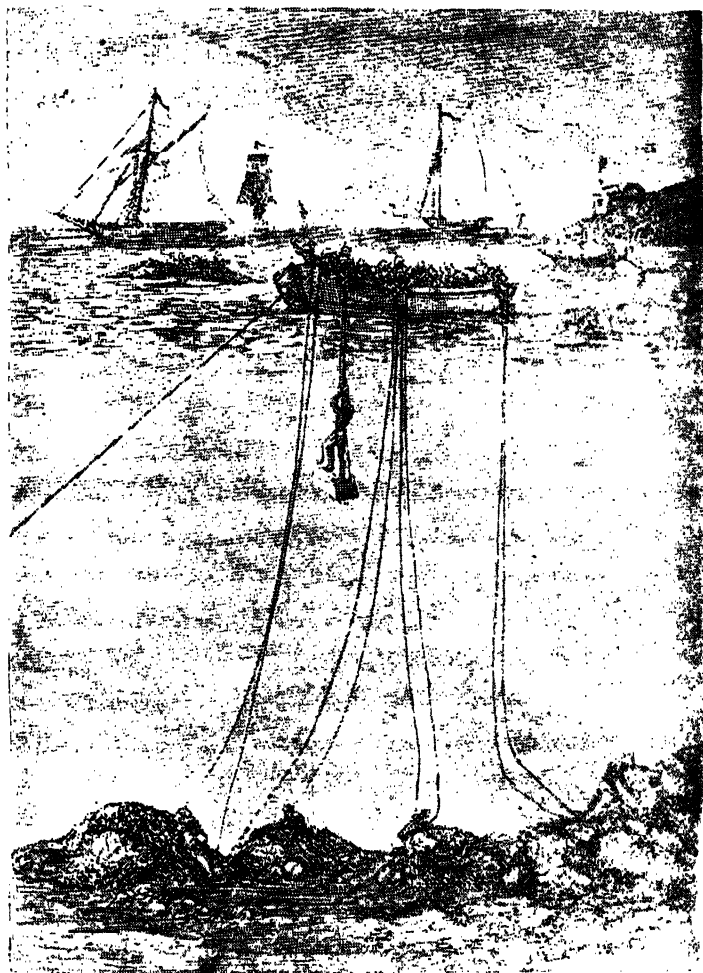
মুক্তা।

ডুবুরিরা যখন জলে অবতীর্ণ হয় তখন দক্ষিণ হস্তে শুক্তি ধরিবার জাল এবং বামহস্তে নৌকাসংযুক্ত অবতরণ রজ্জু ধারণ করে। শীঘ্র জলমগ্ন হইবে বলিয়া বামপদের অঙ্গুলিদ্বারা একখণ্ড বৃহৎ প্রস্তর বদ্ধ রজ্জু ধারণ করে। এইরূপে সজ্জিত হইয়া লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক জলে নিমগ্ন হয়। উক্ত প্রস্তর খণ্ডের সাহায্যে তৎক্ষণাৎ জলের নীচে গমন করে; তলভাগে উপস্থিত হইয়াই পদলগ্ন রজ্জু ছাড়িয়া দেয়, এবং প্রস্তর সমেত রজ্জুটা নৌকামধ্যে উত্তোলিত হয়। এদিকে ডুবারি যত শীঘ্র পারে মুক্তা-শুক্তি সংগ্রহ করিয়া সঙ্কেত করে ও অতি সত্বর বোটের উপর উত্তোলিত হয়। ডুবারিদিগের এই কার্য্যে বিপদ অনেক; হাঙ্গর প্রভৃতি হিংস্র জলচর ডুবারিদিগকে দেখিতে পাইলে গ্রাস করিতে আইসে; এই অনর্থ নিবারণ করিবার জন্য প্রত্যেক ডুবারি এক এক গাছি ছড়ি লইয়া জলমগ্ন হয়, যখন কোন হাঙ্গর মুখব্যাদান করতঃ আগমন করে তখন উক্ত ছড়ি তাহার মুখমধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দেয়; হাঙ্গর যখন ছড়ি চিবাইতে থাকে তখন ডুবারি সত্বর তাহার আক্রমণ পথ অতিক্রম করে। ডুবারিদিগকে যখন ৪০।৫০ হস্ত নিম্নে নামিতে হয়, তখন উপরিস্থ জলের ভারে কখন কখন এরূপ হয় যে যখন ডুবারিরা জলোপরি উত্তোলিত হয় তখন তাহাদের মুখ ও নাসিকা দিয়া রক্ত নির্গত হইতে থাকে। কখন কখন তজ্জন্য মূর্চ্ছিত ও মৃতও হয়।

মুক্তা ধরিবার জন্য সমুদ্রতট জমা দেওয়া হয়; এবং প্রতিবৎসরই এক স্থানে শুক্তি ধরিতে দেওয়া হয় না। ইহার কারণ এই এতদ্বারা শুক্তিকুল ধ্বংস হইয়া যাইতে পারে।

প্রবাল।

প্রবাল নামক রক্তবর্ণ কীট বিশেষ সমুদ্র মধ্যে বাস করিয়া থাকে। আমাদের দেশে সচরাচর উহাকে "পলা" কহিয়া থাকে। সংস্কৃত

গ্রন্থে ইহাকে "রত্নবৃক্ষ" "স্ফুটবিদ্রুম," প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। ইহাতে অনুমান হয় যে, হিন্দুরা পূর্ব্বে ইহাকে উদ্ভিদ্ বিশেষ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। বাস্তবিক পৃথিবীর সর্ব্বত্রই পূর্ব্বে প্রবালকে উদ্ভিদ্ বিশেষ বলিয়াই লোকে জানিত। কিন্তু এক্ষণে উহা প্রাণিবিশেষ বলিয়াই স্থিরীকৃত হইয়াছে।

ইহারা সমুদ্রে বাস করে এবং অনেকগুলি একত্রিত হইয়া তথায় বৃহৎ বৃহৎ দ্বীপ উৎপন্ন করে। ইহাদের শরীর হইতে এক প্রকার দুগ্ধের ন্যায় শ্বেতবর্ণ রস নির্গত হইয়া শরীরকে আচ্ছাদন করে। সেই রসের এমনি আশ্চর্য্য গুণ যে তাহা নির্গত হইয়া অমনি কঠিন হইতে থাকে। শম্বুকের শরীর যেরূপ কঠিন আবরণে আবৃত থাকে, ইহাদের শরীরও উল্লিখিত রসে কঠিন গাত্রাচ্ছাদন হইয়া থাকে। এই আচ্ছাদনকে উহাদের বাসগৃহ বলা যাইতে পারে। এই রস ক্রমে এতই কঠিন ও দৃঢ় হয় যে, সমুদ্রের তরঙ্গাঘাতে ইহাকে কম্পিত বা বিচলিত

করিতে পারেনা। ক্রমে ক্রমে ইহারা বহু ক্রোশ ব্যাপিয়া এক প্রকাণ্ড দ্বীপ প্রস্তুত করে।

স্থির সমুদ্রেই প্রবাল কীটের প্রধান প্রধান কীর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। তথায় একস্থানে অনেক প্রবালদ্বীপ, প্রবাল-শৈল ও প্রবাল-স্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা প্রথমে যে স্থানে অবস্থিতি করে তথায় তাহারা প্রাণত্যাগ করিলে তদুপরি আবার জীবিত প্রবাল কীট তাহার উপর অবস্থিত করিয়া সেই রসে নিজ নিজ গাত্র আবরণ সমুৎপাদন করে। এইরূপে অসংখ্য প্রবাল কীটের শরীর একত্রে রাশিকৃত হইয়া প্রবাল-দ্বীপ উৎপন্ন হইয়া থাকে। তখন ইহাতে সমুদ্রের তরঙ্গে বালুকা মিশ্রিত হইতে থাকে ও বহু প্রকার বৃক্ষের বীজ তরঙ্গ সহকারে আনীত হইয়া অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ক্রমে উহাতে নানাবিধ বৃক্ষ ও লতাদি উৎপন্ন হইয়া এক অভিনব নূতন দেশ বলিয়া খ্যাত হইয়া থাকে। ক্রমে নানাবিধ পক্ষী ও বন্যজন্তুগণও উৎপন্ন বা আশ্রয় লইতে আরম্ভ করে। ক্রমে মনুষ্যগণ এই সমস্ত দ্বীপে আগমণ করিয়া কুটীর নির্ম্মান ও ভূমিকর্ষণ করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে থাকে। এইরূপে এক চমৎকার দেশ উৎপন্ন হইয়া থাকে। দেখ ভগবানের কি আশ্চর্য্য মহিমা, সামান্য এই কীট দ্বারা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দ্বীপ প্রস্তুত হইয়া সেই বিশ্বপতির অনন্ত ও অনির্ব্বচনীয় মহিমা প্রদর্শন করিতে থাকে।

এই সকল প্রবাল-দ্বীপ ভারতমহাসাগরে ও ভূমধ্যসাগরে অধিক পরিমানে দেখিতে পাওয়া যায়। কাপ্তেন বীচি বত্রিশটা প্রবাল-দ্বীপ পরিমাণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে বড়টী ১৩ ক্রোশ ও ছোটটী অর্দ্ধক্রোশ। কোন কোনটী অতিশয় উচ্চ হইয়া থাকে। মালডেন নামক দ্বীপ ৫৩ হস্ত উচ্চ। গোম্বিয়র নামে কতকগুলি প্রবাল-দ্বীপ আছে তাহার একটী ৮৩২ হাত উন্নত। ভগবানের কি আশ্চর্য্য কাণ্ড!!

অদ্ভুত সামুদ্রিক ঘটনা।

সমুদ্রের উৎপত্তি।

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের মতে জগতে এক সময়ে সমুদ্রের অস্তিত্ব ছিল না। প্রথমাবস্থায় আমাদের এই পৃথিবী অগ্নিময় অত্যুষ্ণ তরল পদার্থের রাশি মাত্র ছিল, ক্রমে জুড়াইয়া উপরিভাগ কঠিন হইয়া উদ্ভিদ্ ও প্রাণি সমূহের উৎপত্তির যোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। কোন বস্তু শীতল হইলে তাহার আয়তন স্বল্প হইতে আরম্ভ হয়, এই জন্য পৃথিবীর ত্বগ্‌ভাগ যখন শীতল হইতে লাগিল, তখন অবশ্যই উহা সঙ্কুচিত হইতে আরম্ভ হয়। ইহার ফলে এইরূপ ঘটনা হয় যে পৃথিবীপৃষ্ঠে কিয়দংশ উন্নত ও কিয়দংশ নিম্ন হইতে থাকে। কোথাও বা উচ্চ ভূমি ও পর্ব্বত সমুদ্ভূত হইতে লাগিল, কোথাও বা নিম্ন হইয়া সমুদ্র ও হ্রদ গহ্বর সমুদ্ভূত করিতে লাগিল। ফলতঃ, পৃথিবী শীতল হইয়া তুব্‌ড়াইয়া যাইতে লাগিল, এবং ইহাতে অধিকাংশ স্থান বসিয়া মহান্ গহ্বর সমুৎপন্ন করিল। এই সমস্ত গহ্বরই সমুদ্রগর্ভ বা হ্রদগর্ভ বলিয়া জানিবে। যখন ভূপৃষ্ঠ শীতল হইল তখন তৎসন্নিহিত আকাশস্থ হাইড্রোজন ও অক্‌সিজন বাষ্প রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মিলিত হইয়া জল রূপে পৃথিবীতে আকৃষ্ট হইল। এই সমস্ত জল পৃথিবীতে সংলগ্ন হইলে যেখানে নিম্নদেশ পাইতে লাগিল, তথায় গিয়া জমা হইতে লাগিল। ক্রমে পৃথিবী আরও সঙ্কুচিত হইলে সমস্ত জলভাগ গহ্বর মধ্যে আবদ্ধ হইতে লাগিল এবং স্থলভাগ বহির্গত হইতে লাগিল। এইরূপে জল (সমুদ্র) ও স্থলের উৎপত্তি হইয়াছে। অক্সিজন বাষ্প নাইট্রোজন বাষ্পের সহিত রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মিলিত হইয়া বায়ুরূপে পৃথিবী কর্তৃক আকৃষ্ট হইয়াছিল। এইরূপে জল ও বায়ুর উৎপত্তি হইলে পৃথিবীতে উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর উৎপত্তি আরম্ভ হইয়াছিল।

সমুদ্রজলের আস্বাদ ও বর্ণ।

সমুদ্র নিখিল জলের আকর হইলেও সমুদ্রের নিজ স্থানীয় বারি বিস্বাদ ও অনির্ম্মল। ইহাতে নানাবিধ খনিজ ও ধাতব পদার্থ মিশ্রিত থাকে; সর্ব্বাপেক্ষা লবণের ভাগ অধিক থাকায় সমুদ্রজল একেবারে অপেয় হইয়া রহিয়াছে। সকলেই জানেন সমুদ্রজল লবণাক্ত, কিন্তু কি কারণে উহার লবণাক্ততা জন্মিয়াছে, নদীজলেই বা লবণাক্ততা নাই কেন তাহা অনেকে জানেন না। সমুদ্রে যে সমস্ত নদী নিপতিত হইতেছে, তাহারা জলের সহিত বহুল পরিমাণ মৃত্তিকা আনয়ন করিয়া সমুদ্রজলের সহিত মিশ্রিত হয়। এই মৃত্তিকার মধ্যে লবণাংশ বিদ্যমান থাকে; সেই লবণাংশ সমুদ্রজলে মিলিত হইয়া যায়, কিন্তু সূর্য্যোত্তাপে যখন জল বাষ্পাকারে আকাশে উত্থিত হয়, তখন লবণাংশ থাকিয়া যায়। এইরূপে বহুবৎসরে সমুদ্রের লবণাক্ততা সমুদ্ভূত হইয়াছে। নদীজল সর্ব্বদাই প্রবহমান, এইজন্য উহাতে লবণাক্ততা জন্মাইতে পারে না; নদী প্রতিক্ষণেই নূতন জল বহন করিতেছে, এ নিমিত্ত নদীজল সুমিষ্ট ও স্বাস্থ্যজনক।

সমুদ্রের গভীরতা।

সাগরের কোন স্থানেই গভীরতা এত অধিক নয় যে, তাহা সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বতচূড়ার সহিত পরিমাণে তুল্য হইতে পারে। হিমালয় পর্ব্বতস্থ দেবগিরির চূড়া সমুদ্র তট হইতে উচ্চতায় ২৯,০০০ ফুট; অর্থাৎ সমুদ্র-তটে যদি উক্ত পর্ব্বতচূড়া অবস্থিতি করিত, তাহা হইলে তাহার উচ্চতা উক্তরূপ হইত। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা গভীর সমুদ্রের গভীরতা ২.২২৯ ফুটের অধিক নহে, অর্থাৎ সমুদ্র মধ্যে যেস্থান সর্ব্বাপেক্ষা গভীর তাহার জলোপরিভাগ হইতে নিম্নভাগে গমন করিলে তলদেশে উপস্থিত হইতে দুই ক্রোশের কিঞ্চিৎ অধিক পথ অতিক্রম করিতে হয়।

স্থলভাগ যেমন সর্ব্বত্র সমতল নহে সমুদ্রগর্ভও তদ্রূপ সর্ব্বত্র সমতল নয়। সমুদ্রগর্ভে উন্নত পর্ব্বতচূড়া, অধিত্যকা, গিরিনিতম্ব, উপত্যকা ও সমতলভূমি এসমস্তই অবস্থিতি করে। কোন কোন পর্ব্বতচূড়া জল ছাড়াইয়া উপরে উঠিয়াছে। সমুদ্রমধ্যেও আগ্নেয়গিরি আছে এবং তাহা হইতে সময়ে সময়ে অগ্ন্যুৎপাতও হইয়া থাকে। এজন্য স্থানে স্থানে নূতন দ্বীপ নির্ম্মিত হয়। পৃথিবীর পূর্ব্বোক্ত সঙ্কোচন প্রণালীর বশবর্ত্তী হইয়া সমুদ্রমগ্ন স্থান মহাদেশে পরিণত হইয়াছে এবং উচ্চ ভূমিও সমুদ্রগর্ভে নীত হইয়াছে।

জোয়ার ও ভাঁটা।

অনেকেই সমুদ্রে এবং সমুদ্রগামিনী নদী সমূহে জোয়ার ও ভাঁটা সন্দর্শন করিয়াছেন এবং ইহাও লক্ষ্য করিয়াছেন যে পূর্ণিমা ও অমাবস্যার সময় অধিক জোয়ার হয় এবং সপ্তমী অষ্টমীর সময় স্বল্প জোয়ার হয়। কিন্তু কি কারণে জোয়ার ভাঁটা হয় ও তিথি বিশেষে কেনই বা উহার ন্যূনতাধিক্য হইয়া থাকে তাহা অনেকে অবগত নহেন। আমরা সংক্ষেপে তাহা বিবৃত করিতেছি।

সকলেই বুঝিবেন, তিথিবিশেষে যখন জোয়ার অধিক বা অল্প হয় তখন চন্দ্রের সহিত উহার কোনরূপ সম্বন্ধ অবশ্যই আছে। বাস্তবিক তাই বটে, বিজ্ঞানবলে নিরূপিত হইয়াছে যে চন্দ্রের আকর্ষণই জোয়ার ভাঁটার প্রধান কারণ। চন্দ্র ও সূর্য্য উভয়েই পৃথিবীকে আকর্ষণ করিতেছে, এই আকর্ষণে স্থলভাগ কঠিন বলিয়া তাহাতে কোন পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় না; কিন্তু জল তরল বলিয়া তাহা আন্দোলিত হইয়া চন্দ্র বা সূর্য্যের দিকে যাইতে উদ্যত হয়; কিন্তু পৃথিবী আবার জলকে নিজের দিকে টানিয়া রাখে, এই কারণে জল, চন্দ্র বা সূর্য্যের দিকে একেবারে চলিয়া যাইতে পারে না; তবে কিয়ৎপরিমাণে উর্দ্ধগামী

হইতে থাকে, এইরূপ হইলেই তাহাকে জোয়ার কহে। একস্থানে জোয়ার হইলে তথায় যে জলবৃদ্ধি হয় তাহা অবশ্যই পার্শ্ববর্ত্তী স্থান হইতে আনীত হয়। এইজন্য তখন পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে ভাঁটা হইয়া থাকে।

সূর্য্য পৃথিবী অপেক্ষা বহুগুণে বৃহৎ, কিন্তু চন্দ্র পৃথিবী অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র; অতএব সূর্য্যের আকর্ষণ চন্দ্রের আকর্ষণ অপেক্ষা অনেক অধিক হওয়াই সম্ভব, অপরাপর বিষয়ে তাহাই হইয়া থাকে। কিন্তু জোয়ার সম্বন্ধে সূর্য্যের আকর্ষণ অপেক্ষা চন্দ্রের আকর্ষণ অধিকতর বলবান্, ইহার কারণ এই সূর্য্যাপেক্ষা চন্দ্র পৃথিবীর অনেক নিকটে অবস্থিতি করিতেছে। অমাবস্যার সময় চন্দ্র সূর্য্যের নিম্নভাগে আগমন করে, এইজন্য সে সময় চন্দ্র ও সূর্য্যের মিলিত আকর্ষণে অধিক জোয়ার হয়। আর সপ্তমী অষ্টমীর সময় চন্দ্র উপরে অবস্থিতি করিলে সূর্য্য পার্শ্বে অবস্থিতি করে, এইজন্য সূর্য্য চন্দ্রের আকর্ষণকে কিয়ৎপরিমাণে অভিভূত করায় তখন জোয়ার স্বল্প হইয়া থাকে।

পৃথিবীর এক অংশে জোয়ার হইলে, তাহার বিপরীত অংশেও সেই সময়ে জোয়ার হইয়া থাকে; এইজন্য প্রতিদিন দুইবার জোয়ার হয়। চন্দ্রের আকর্ষণে একদিকের জল যখন আকৃষ্ট হইয়া ঊর্দ্ধগামী হইতে থাকে তখন বিপরীতদিকৃস্থিত জলভাগ অপেক্ষা তন্নিম্নস্থ স্থলভাগ চন্দ্র-কর্ত্তৃক অপেক্ষাকৃত সত্বর আকৃষ্ট হইয়া থাকে। কারণ মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম এই দূরতর বস্তুর আকর্ষণও মৃদুতর হইয়া থাকে। যখন কোন স্থানের উপরিভাগে চন্দ্র আগমন করে তখন চন্দ্রকর্ত্তৃক প্রথমে জল, তৎপরে তন্নিম্নস্থ ভূমি, তৎপরে বিপরীতদিকের জল আকৃষ্ট হইয়া থাকে। এই কারণে বিপরীতদিকের জল হইতে তন্নিম্নস্থ ভূমি একটু সরিয়া যায়। কিন্তু জল আবার পৃথিবী কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া নামিয়া পড়ে, এইজন্য পার্শ্ব হইতে জল আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করিয়া থাকে। সুতরাং বিপরীতদিকেরও জল বৃদ্ধি হওয়াতে জোয়ার হইয়া

থাকে। পূর্ণিমার সময় চন্দ্রের নিম্নে পৃথিবী ও তন্নিম্নে সূর্য্য, এইভাবে অবস্থান পরিবর্ত্তন হওয়ায় একদিকে চন্দ্র কর্ত্তৃক জোয়ার ও অপরদিকে সূর্য্য কর্ত্তৃক জোয়ার সম্পাদিত হয় এবং প্রত্যেকেরই জোয়ার উৎপাদন করিবার ক্ষমতা বিপরীতদিকেও নিয়োজিত হইয়া থাকে; এই কারণে পূর্ণিমার সময়ও অধিক জোয়ার হইয়া থাকে। কিন্তু পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে চন্দ্র অপেক্ষা সূর্য্যের জোয়ার উৎপাদন করিবার ক্ষমতা কম, এইজন্য পরস্পর বিপরীত স্থানে অবস্থিতি করায় অমাবস্যার জোয়ার অপেক্ষা পূর্ণিমার জোয়ার কিঞ্চিৎ কম হইয়া থাকে। সমুদ্রে জোয়ার হইলেই সমুদ্রগামি নদীতেও জোয়ার হয়।

তুষার-মণ্ডিত সমুদ্র।

পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্ত অত্যন্ত শীতল বলিয়া তত্রত্য সমুদ্রজল জমিয়া অতি বৃহৎ তুষার-শৈল সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। সমুদ্র মধ্যস্থ দ্বীপাদির মধ্যে যে সমস্ত পর্ব্বত অবস্থিতি করে, তাহার শিখরভাগ হইতেও বিশাল তুষারখণ্ড সমূহ স্থানচ্যুত হইয়া সমুদ্রমধ্যে গিয়া উপস্থিত হয়। উপরি কথিত উভয় কারণে মেরুসন্নিহিত সমুদ্রমধ্যে চিরকাল তুষাররাশি বিরাজিত থাকে। কতদূর ব্যাপিয়া যে তুষার-রাজ্য বিস্তৃত তাহা সম্যক্ নিরূপিত হয় নাই।

নাবিকগণ কহিয়া থাকেন, যে একরাত্রিমধ্যে সমুদ্রোপরি কয়েক ইঞ্চ পরিমিত বেধ বিশিষ্ট তুষারক্ষেত্র সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। ক্রমে ঐ সকল তুষার ক্ষেত্র উন্নত হইতে আরম্ভ হয়; অবশেষে এত উন্নত হয় যে পর্ব্বতশিখরতুল্য আকার ধারণ করে। সমুদ্রস্থ এক একটা তুষার-ক্ষেত্র এতদূর বিস্তৃত হইতে পারে যে এক একটা ক্ষুদ্র রাজ্য বলিলেই হয়। এই সকল বৃহৎ তুষারখণ্ড যখন বায়ুভরে বিচলিত হইয়া পরস্পর আহত হয়, তখন শত শত কামানের শব্দের ন্যায়

অনুভূত হইয়া থাকে। ইহার মধ্যস্থলে কোন জাহাজ পতিত হইলে জাতাঁর মধ্যস্থিত কলায়ের ন্যায় চূর্ণ হইয়া যায়। কখন কখন এরূপ হয় যে জাহাজ তুষাররাশি সমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া অবরুদ্ধভাবে অবস্থিত করিয়া থাকে। এক্ষণে যদি জাহাজে খাদ্যদ্রব্যের অভাব হয় তাহা হইলে নাবিকগণ অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যাহারা উত্তরমহাসাগরে জাহাজ লইয়া গিয়া অতিসাহসিকতার পরিচয় দিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অল্প লোকেই প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। পরম-কারুণিক সর্ব্বান্তর্যামী বিশ্বনাথ জলচরজীবের

প্রতি যে কিরূপ করুণা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা একবার সমালোচনা কর। দেখ, জল যদি জমিয়া ভারী হইত তাহা হইলে সেইভাবে জলচরগণের প্রাণবিয়োগ ঘটিত, কিন্তু তাহা না হইয়া তুষার জলাপেক্ষা লঘু হওয়ায় তাহা উপরিভাগে ভাসিয়া থাকে এবং জলচরগণ অধিকতর নিরাপদে তন্নিম্নে অবস্থিত করিয়া থাকে।

আর দেখ, বরফ হইবার সময় সমুদ্রের লবণাংশ বরফের সহিত মিলিত হয় না। যেমন সমুদ্রজল সূর্য্যোত্তাপে বাষ্প হইবার সময়

তাহার সহিত লবণাংশ মিশ্রিত হয় না, তুষার হইবার সময়েও ঐরূপ ঘটনা হয়। শীতপ্রভাবে শীত-প্রধান দেশের জলাশয় সমূহ এরূপ জমিয়া যায় যে তাহার উপর দিয়া অনায়াসে পদব্রজে গমন করা যায়। নদীর এপার হইতে ওপার যাইতে নৌকার আবশ্যকতা হয় না। ঐ সকল জলাশয়ের উপরিভাগ মাত্র তুষারাচ্ছাদিত থাকে, নিম্নভাগে অবশ্যই জল অবস্থিতি করে। নদীসমূহ অন্তঃসলিলা হইয়া অবশ্যই প্রবাহিত হয়। কথিত আছে ৪০১ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণসাগর সমস্ত এককালে তুষারাবৃত হইয়াছিল, এবং ৮৬০ খৃষ্টাব্দে ডার্ডেনালিস প্রণালী এরূপ জমাট বাঁধিয়া গিয়াছিল যে, অনায়াসেই পদব্রজে গমনাগমন চলিয়াছিল। ১৩২৩ খৃষ্টাব্দে বল্টিক সাগরের দক্ষিণাংশ এরূপ জমিয়া গিয়াছিল যে কোপেন্ হেগেন্ হইতে ডান্‌জিগ্ পর্য্যন্ত পদব্রজে গমন করা যাইত। উত্তর শীতপ্রধান দেশে শীতের এতই প্রাদুর্ভাব যে উষ্ণজলে হস্তধৌত করিয়া তৎক্ষণাৎ মুছিবার সময় দেখা যায় যে হস্তস্থিত জলাংশ জমিয়া গিয়াছে।

ভূগর্ভস্থ নদী ও হ্রদ।

আফ্রিকা মহাদেশের অন্তর্গত আলজিরিয়া প্রদেশান্তর্গত বিখ্যাত জলপ্রপাতের সন্নিধানে কতকগুলি শৈলশ্রেণী বর্ত্তমান আছে। খনি-কেরা তথায় কর্ম্ম করিতেছিল এবং কামনদ্বারা বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড স্থানচ্যুত করিতেছিল। একস্থানে প্রস্তররাশি উক্ত প্রকারে স্থানচ্যুত হওয়ায় দেখা গেল, এক সুড়ঙ্গ সেইস্থান হইতে ভূমির মধ্য দিয়া গমন করিয়াছে। এই সুড়ঙ্গ দিয়া জলপ্রবাহ চলিতেছে দেখিয়া অনেকে কৌতূহলাক্রান্ত হইল এবং ঐ সুড়ঙ্গদিয়া গমন করিলে কোথায় যাওয়া যায়, কি দেখা যায়, তাহা জানিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হইল। একখানি ক্ষুদ্র নৌকা এই উপলক্ষে সজ্জিত হইল এবং উক্ত ভূগর্ভ-

প্রবাহিনী নদীর উপর দিয়া ভূমির অভ্যন্তর ভাগে চলিয়া গেল। তথায় ঘোর অন্ধকার, সুতরাং তাহারা জ্বলন্ত মশাল হস্তে লইয়া গমন করিয়াছিল। ক্রমে গমন করিতে করিতে দেখা গেল যে উক্তনদী ভূগর্ভস্থ এক হ্রদে মিলিত হইয়াছে। উহারা ঐ হ্রদ মধ্যে গমন করিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চারণ করিয়া দেখিল যে ঐ হ্রদের জল অতি নির্ম্মল। ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা গেল যে অত্যন্ত উচ্চস্থানে ছাদের ন্যায় আচ্ছাদন আছে এবং মশালের আলোকে তাহা যেন চক্‌মক্ করিয়া প্রদীপ্ত হইতেছে। স্থানে স্থানে ছাদ হইতে জলমধ্য ভাগ পর্য্যন্ত স্তম্ভবৎ ভূভাগ বিদ্যমান আছে। তাহারা হ্রদমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিতে পাইল যে অপর একদিকে এক প্রশস্ত নদীবৎ জল-প্রণালী চলিয়া গিয়াছে।

উক্ত খনিকেরা সেই নদীমধ্যে গমন করিতে সাহস না করিয়া ফিরিয়া আসিল। তাহারা দেখিল কতকগুলি মৎস্য আসিয়া নৌকার নিকট উপস্থিত হইতেছে। উহারা কৌতুকবশতঃ কতকগুলি মৎস্য ধৃত করিল। তাহারা সহজেই উহাদিগকে ধরিল, কারণ, তথায় অপর কোন উপদ্রব না থাকায় মৎস্যগণ ভীত হইয়া সত্বর পলায়ন করে না ; ইহাতে তাহারা ভয় যে কি বস্তু তাহা জানে না। মৎস্যগণ যখন আলোকে আনীত হইল, তখন দেখা গেল যে উহারা অন্ধ। চিরকাল অন্ধকারে থাকিতে হইবে বলিয়া পরমেশ্বর নিষ্প্রয়োজন বোধে উহাদের চক্ষু প্রদান করেন নাই। অনেকে কহেন ঐ সকল মৎস্য পৃষ্ঠ হইতেই নালী বিশেষ দ্বারা উক্তস্থানে উপস্থিত হইয়া আর বাহিরে আসিতে পারে নাই। ক্রমে উহাদের সন্তানসন্ততি তথায় থাকিয়া, অন্ধকার বশতঃ চক্ষুর ক্রিয়া না থাকায়, ক্রমশঃ অন্ধ হইয়া গিয়াছে।

২য় খণ্ড।

স্থল।

অদ্ভুত শ্মশ্রু।

স্থল-ভাগের আশ্চর্য্য বিবরণ।

অদ্ভুত মনুষ্য।

বামন।

জেফ্রি হড্‌সন্ নামক এক অদ্ভুত বামন ১৬১৯ খৃষ্টাব্দে রটলণ্ড-শায়রে জন্মগ্রহণ করে। তাহার পিতামাতা সাধারণ মনুষ্যের মত দীর্ঘ কলেবর ছিল। ইহার যখন আট বৎসর বয়স তখন বাকিংহামের ডিউক-পত্নীর নিকট উপহারস্বরূপ প্রেরিত হয়। তখন ইহার দৈর্ঘ্য দেড় ফুট মাত্র। কথিত আছে, প্রথম চার্লসের বিবাহ সময়ে যখন বর ও কন্যা নিমন্ত্রিত বহু জনগণের সহিত ভোজনার্থ উপবেশন করেন, তখন উক্ত বামনকে এক বৃহৎ পিষ্টক মধ্যে পূরিয়া টেবিলের উপর সংস্থাপিত করা হয়। যখন সকলে ভোজন করিতে আরম্ভ করেন, তখন সে সহসা পিষ্টক মধ্য হইতে সশস্ত্র বহির্গত হয় এবং মহিলাগণের দিকে স্বীয় ক্ষুদ্র তরবারি সঞ্চালন করত গমন করিতে থাকে। এই দৃশ্য দর্শন করিয়া তত্রত্য নর-নারী সকলেই পরম বিস্ময় ও হাস্যরসে অভিষিক্ত হন। এই দৃশ্য সম্বন্ধে চিত্র প্রস্তুত হইয়া বাজারে বহুমূল্যে বিক্রীত হয়; এখনও বিলাতের কোন কোন বড় লোকের বাটীতে উক্তরূপ চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। তৎপরে রাজ্ঞী হেন্‌রিয়েটা মেরিয়া ঐ বামনকে রাখিয়া দেন। সেখানে থাকিয়া রাজপরিবারস্থ সকল লোকের সহিতই সে সর্ব্বদা কলহ করিত। একবার সে টবে মুখ প্রক্ষালন করিতে ছিল, হঠাৎ সে টবের জলে পতিত হইয়া নিমগ্ন হইবার উপক্রম হইয়াছিল। আর একবার সে টেম্‌স নদীর জলে ডুবিয়া যায়, কিন্তু হঠাৎ এক চাপ্‌ড়া ঘাস ভাসিয়া যাইতে দেখিয়া তদবলম্বনে তীরে উত্থিত হয়। ক্রফ্‌ট্ নামে এক সাহেবের সহিত জেফ্রির দ্বন্দ্ব যুদ্ধ হইয়াছিল। ইহাতে জেফ্রির গুলিতেই ক্রফ্‌ট্

প্রাণত্যাগ করেন। মাইটেন্স্ ও ভ্যান্ডাইক নামক বিলাতের বিখ্যাত চিত্রকর কর্ত্তৃক অনেক বার জেফ্রির চিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল। জেফ্রির ক্ষুদ্র ফতুয়া ও ষ্টকিং অক্‌স্‌ফোর্ডের "আশ্‌মেলিয়ম্ মিউজিয়ম্" নামক কৌতুকাগারে এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

ম্যাথিউ নামে এক বামন ছিল, তাহার হস্ত, পদ, উরুদেশ এ সমস্ত কিছুই ছিলনা। যেস্থান দিয়া হস্ত বহির্গত হয়, সেস্থানে কেবল মৎস্যের ডানার মত কিয়দংশ বহির্গত হইয়াছিল। এই ডানা দ্বারা সে কলম ধরিয়া লিখিতে পারিত, তূলি ধরিয়া চিত্র করিতে পারিত, পাশা খেলিতে ও বাঁশি বাজাইতে পারিত। জোসেফ্ নামে এক বামন অত্যন্ত রসিক ছিল; সে নানারূপ কথা বলিয়া লোককে হাসাইতে পারিত। চৌদ্দ বৎসর বয়সের সময় সে ভায়েনার মহারাণী মেরিয়া থেরেসার নিকট উপহার রূপে প্রেরিত হয়; তখন তাহার দৈর্ঘ্য আঠার ইঞ্চি অর্থাৎ এক হাত মাত্র। মহারাণী তাহাকে ক্রোড়ের উপর স্থাপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "জোসেফ্, তুমি ভায়েনায় আসিয়া এমন কোন বস্তু দেখিয়াছ, যে তোমার আশ্চর্য্য বোধ হয়" জোসেফ্ উত্তর করিল, "হাঁ, একটী বিশেষ আশ্চর্য্য এই যে আমি এমন ক্ষুদ্র ব্যক্তি হইয়াও এরূপ মহতী রাজ্ঞীর ক্রোড়ে অবস্থিতি করিতেছি।" যখন সে মহারাণীর হস্তস্থিত অঙ্গুরীয় মধ্যস্থ হীরকের উজ্জ্বলতা সন্দর্শন করিতেছিল, তখন মহারাণী কহিলেন, "কেমন, এটা কি তোমার সুন্দর বোধ হইতেছে?" জোসেফ্ তৎক্ষণাৎ বিনীতভাবে কহিল, "আমি অঙ্গুরীয়য় দেখিতেছিনা, আমি আপনার হস্তের সৌন্দর্য্য অবলোকন করিতেছি, আমার বাসনা আপনার হস্তচুম্বন করিব।" মহারাণী অনুগ্রহ করিয়া তাহাকে হস্ত চুম্বন করিতে দিলেন।

নিকোলাস্ ফেনি নামে অপর এক বামন পোলণ্ডের রাজা কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়াছিল। তাহাকে যখন ক্রিশ্চিয়ান মতে বাপ্তাইজ্‌ড্

করিবার জন্য গির্জ্জার মধ্যে লইয়া যাওয়া হয়, তখন তাহাকে একখানি থালায় বসাইয়া তথায় লইয়া যাওয়া হয়। ক্যালভিন্ ফিলিপ্ নামক এক বামন মেসাচুসেট্স্ রাজ্যে ব্রিজ্ওয়াটার নামক স্থানে ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করে। সে কখনও এক সেরের অধিক ভারী হয় নাই।

দীর্ঘাকার মনুষ্য।

যে সকল মনুষ্য ছয় ফুট লম্বা তাহারাই অসাধারণ দীর্ঘাকার বলিয়া আমরা বিস্মিত হই; কিন্তু নিম্নে এমন কএকটী মনুষ্যের উল্লেখ করা যাইতেছে যে, তাহাদের দেহ পরিমাণ সমালোচনা করিলে বাস্তবিক বিস্মিত হইতে হয়। প্রসিয়ার সম্রাট্ ফ্রেডরিকের একদল সৈন্য ছিল, তাহার কোনটীই দৈর্ঘ্যে সাত ফুটের ন্যূন ছিল না। একজন পোলণ্ডের রাজা সাধারণ অবয়ব সম্পন্ন হইলেও হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক উক্ত সৈন্যদিগের মধ্যে এক জনের চিবুকদেশ স্পর্শ করিতে পারেন নাই। অপর এক আয়র্লণ্ডবাসী, পেট্রিক্ কটর্ এরূপ দীর্ঘাকৃতি ছিলেন যে নর্দম্টনে রাস্তায় যে আলোক প্রদত্ত হয়, তাহাতে তিনি চুরট্ ধরাইয়া লইতেন। চার্লস্ ওব্রায়েন্ নামক এক আয়র্লণ্ডবাসী আট ফুট চারি ইঞ্চি দীর্ঘ ছিলেন ওব্রায়েনের ভয় ছিল পাছে মৃত্যুর পর তাঁহার অস্থি কোন সাধারণ স্থানে প্রদর্শনার্থ রক্ষিত হয়; এই জন্য তিনি এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে মৃত্যুর পর তাঁহার দেহ যেন সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু শরীর-তত্ত্ব-বিদ্ উলিয়াম্ হণ্টার তাঁহাকে প্রায় পাঁচ শত গিনি প্রদান করিয়া, তাঁহার মৃত্যুর পর অস্থি গ্রহণ করিবেন এরূপ স্বীকার করাইয়া লয়েন। বিগ্সাম্ নামক এক স্কটলণ্ডীয় দ্বারবান্ চতুর্থ জর্জের উদ্যানরক্ষক ছিলেন; তিনি আট ফুট দীর্ঘ ছিলেন। বর্ত্তমান কালে জোসেফ ব্রাইস্ নামক এক ফরাসী এবং চ্যাংউগাউ নামক এক চীনবাসী ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে জনসাধারণের

নিকট প্রকাশিত হন। ইহাঁদের মধ্যে প্রথমোক্ত ব্যক্তি সাত ফুট সাত ইঞ্চি এবং শেষোক্ত ব্যক্তি সাত ফুট নয় ইঞ্চি দীর্ঘ ছিলেন।

দীর্ঘায়ু মনুষ্য।

মনুষ্যের পরমায়ু কত, এই সম্বন্ধে অনেক পণ্ডিত বহু অনুসন্ধান করিয়া নির্ণয় করিয়াছেন যে মনুষ্য ঊর্দ্ধ সংখ্যা এক শত বৎসর জীবিত থাকে। ইয়ুরোপীয় পণ্ডিত ফ্লরেন্স্ কহেন, যে প্রাণী পূর্ণাবয়ব হইতে যত বয়স প্রাপ্ত হয়, সে তাহার পাঁচ গুণ বাঁচিতে পারে। এই হিসাবে মনুষ্য ১০০ বৎসর, অশ্ব ২৫ বৎসর, উষ্ট্র ৪০ বৎসর, গো ২০ বৎসর, সিংহ ২০ বৎসর, কুক্কুর ১০ বৎসর বাঁচিতে পারে। হিন্দুদিগের শাস্ত্রেও মনুষ্য যে শতবৎসর বাঁচিয়া থাকে তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু অনেক স্থলেই মনুষ্যের শত বৎসর পরমায়ু হয় না। ইয়ুরোপীয় গণনা মতে উচ্চ শ্রেণীস্থ লোক গড়ে ৫০ বৎসর, ব্যবসায়ী প্রভৃতি ৫৫ বৎসর, শ্রমজীবি লোক ৬০ বৎসর এবং কারখানার কঠিন পরিশ্রমীরা ৬৫ বৎসর জীবিত থাকে। নানা কারণে মনুষ্যের আয়ু কমিয়া যায়। কিন্তু নিম্নে এমন কয়েকটী লোকের নাম দেওয়া যাইতেছে যে তাহারা শতবৎসর অপেক্ষাও অনেক অধিক বাঁচিয়াছিল।

গ্যালিরিয়া ক্যাপিওলা নাম্নী এক অভিনেত্রী এক থিয়েটারে ক্রমাগত ৯৯ বৎসর অভিনয় করিয়াছিলেন। তাঁহার অভিনয়ের শেষ বৎসর পর্য্যন্ত তিনি যুবতীর ন্যায় দৃষ্ট হইতেন। তাঁহার বয়স কত হইয়াছিল তাহা কেহ বলিতে পারে না। ভেস্পিসিয়ানের সময়ে যে সেন্সস্ বা লোক গণনা হইয়াছিল তাহাতে দেখা যায়, ৫৪ জন ১০০ বৎসর বয়স্ক, ৫৭ জন ১১০ বৎসর, দুই জন ১২৫ বৎসর, দুই জন ১৩৫ বৎসর এবং একজন ১৪০ বৎসর বয়স্ক ছিল। গ্যালেন নামক এক প্রসিদ্ধ ডাক্তার ১৪০ বৎসর জীবিত ছিলেন।

টমাস্‌পার্‌ নামক এক ব্যক্তি শ্রপ্‌শায়রের অন্তর্গত আল্‌বারবরি নামক স্থানে ১৪৮৩ খৃষ্টাব্দে ৪র্থ এডোয়ার্ডের সময় জন্মগ্রহণ করেন। ৮০ বৎসর বয়সের সময় তিনি বিবাহ করেন ; ৩২ বৎসর কালের মধ্যে দুইটী সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়া অকালে মৃত হয়। ১২০ বৎসর বয়সের সময় তিনি ক্যাথেরাইন্‌ মিন্টন নাম্নী এক স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্ত হন। ইহাকে বিবাহ করিয়া তিনি একটী সন্তান লাভ করেন।

১৬৩৫ খৃষ্টাব্দে ১৫ই নভেম্বর ১৫২ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। ইঁহার প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইল। অপর এক ব্যক্তি ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে একটা ভূমির উপর দিয়া পথ ছিল কিনা, তাহা সাক্ষ্য দিবার জন্য আদালতে আনীত হইয়াছিলেন। ইনি ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে ৮ই ডিসেম্বর ১৬৯ বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করেন।

মেধাবী মনুষ্য।

কর্ডিনাল মেজোফন্টি নামক এক ব্যক্তি ইউরোপ খণ্ডে জন্মগ্রহণ করিয়া ইয়ুরোপীয় সমস্ত ভাষা এরূপ সুন্দর আয়ত্ত করিয়াছিলেন, যে তিনি কোন্ দেশের লোক তাহা কেহ বুঝিতে পারিত না। যখন কোন ইংরাজের সহিত কথা কহিতেন, তখন সে মনে করিত এই ব্যক্তি নিশ্চয়ই ইংরাজ; আবার যখন কোন পর্ত্তুগিজের সহিত কথা কহিতেন, তখন সে মনে করিত এই ব্যক্তি নিশ্চয়ই পর্ত্তুগালবাসী। তিনি এসিয়ারও সমস্ত ভাষা আয়ত্ত করিয়াছিলেন। সর্ব্বশুদ্ধ তিনি ৭০ হইতে ৮০ প্রকার ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ্চ তাঁহার মৃত্যু হয়।

বঙ্গদেশে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন নামে এক প্রসিদ্ধ মহাপণ্ডিত ছিলেন। ত্রিবেণীর নিকট তাঁহার নিবাস ছিল। তাঁহার বংশাবলী এখনও বিদ্যমান আছেন। ইংরাজেরা যখন প্রথমে এদেশে আধিপত্য করিতে আরম্ভ করেন, তখন তাঁহার জন্ম হয়। জগন্নাথের স্মরণশক্তি অসাধারণ ছিল, একবার যাহা কিছু শ্রবণ করিতেন তাহা আর বিস্মৃত হইতেন না। তাঁহার স্মারকতা শক্তির এক উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। একদা তিনি গঙ্গাস্নান করিয়া গঙ্গাতীরেই সন্ধ্যাহ্নিক সম্পন্ন করিতেছিলেন। তখন সেস্থানে অপর কেহই ছিলনা, কেবল দুইজন গোরা উপস্থিত ছিল। উহারা ক্রমে আপনা আপনি বচসা

করিতে আরম্ভ করিল; কিয়ৎক্ষণ পরে উহারা মারামারি করিতে লাগিল। ক্রমে উভয়ে এরূপ মারামারি করিল যে উহারা বিচারার্থ আদালতে নীত হইল। তাহাদের সাক্ষী কে আছে, তাহা জিজ্ঞাসা করায় তাহারা কহিল, এক ব্রাহ্মণ জলের নিকট বসিয়া হাত মুখ নাড়িতেছিল। অনুসন্ধান দ্বারা নির্ণয় হইল জগন্নাথ তথায় বসিয়াছিলেন, তিনি সাক্ষ্য প্রদানার্থ আদালতে নীত হইলেন। জগন্নাথ জজের নিকট কহিলেন, আমি তো ইংরাজী বুঝি না, তবে উহাদের মধ্যে যে যেরূপ শব্দ উচ্চারণ করিয়াছে তাহা বলিতে পারি। এই বলিয়া তিনি, যে যাহা বলিয়াছিল আনুপূর্ব্বিক তাহা উচ্চারণ করিলেন। ইহাতে জজ্ সাহেব কাহার কিরূপ দোষ তাহা স্থির করিয়া মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিলেন। জজ্ সাহেব ইংরাজ ছিলেন, তিনি প্রথমে কোন মতেই বিশ্বাস করিতে পারেন নাই যে জগন্নাথ ইংরাজী জানেন না। আশ্চর্য্য!!!

লিউবেক প্রদেশে ১৭২১ খৃষ্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারি হিনিকার নামে এক বালক জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তাহার যখন দশমাস বয়স তখন সে সমস্ত কথাই কহিতে শিখিয়াছিল। দুই বৎসর বয়সে বাইবেলের ঐতিহাসিক সমস্ত অংশই কণ্ঠস্থ করিয়াছিল। তিন বৎসর বয়সের সময় ইতিহাস ও ভূগোল সম্বন্ধীয় সমস্ত প্রশ্নেরই উত্তর দিতে পারিত এবং সেই সময়ে লাটিন ও গ্রীক ভাষা শিক্ষা করিয়াছিল ও লিখিতেও শিখিয়াছিল। কিন্তু এই বালকটী বাঁচিল না। ১৭২৫ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জুন উক্ত বালকটীর মৃত্যু হয়।

স্থূলাকার মনুষ্য।

ইংলণ্ডে লিসেষ্টার্ নামক স্থানে এরূপ এক স্থূলাকার জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, যে তাহার ওজন কিছু কম নয় মণ। ইহার নাম ছিল

ডানিয়েল লাম্বার্ড। লাম্বার্ড অপেক্ষা অধিক বা তত্তুল্য ভার বিশিষ্ট মনুষ্য এপর্য্যন্ত কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় নাই। যে সকল মনুষ্য তিন মণ বা সাড়ে তিন মণ ভারী তাহারাই বিপরীত স্থূলাকার বলিয়া আমরা বিস্মিত হই। লাম্বার্ড যে কিরূপ ভয়ানকাকৃতি ছিল তাহা বিবেচনা কর। লাম্বার্ড ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ২১শে জুলাই প্রাণ পরিত্যাগ করে। তাহার রোগের কিছুমাত্র চিহ্ন দেখা যায় নাই ; যখন পূর্ব্বদিন রাত্রি-কালে শয়ন করে তখন সম্পূর্ণ সুস্থকায় ছিল, কিন্তু পরদিন প্রাতঃকালে তাহার প্রাণ বায়ু বহির্গত হইয়া যায়।

নরভুক্ মনুষ্য।

দক্ষিণ আমেরিকার দ্বীপসমূহে এবং আশিয়ারও অনেক দ্বীপে এরূপ মনুষ্য অদ্যাপি বাস করে যে, তাহারা নরমাংস পরম উপাদেয় বোধে ভক্ষণ করিয়া থাকে। যদি কাহারও উপর কোন কারণ বশতঃ বিদ্বেষ বা ক্রোধের উদয় হয়, তাহা হইলে কিরূপে তাহার মাংস ভোজন করিবে তাহাই অনুসন্ধান করিতে থাকে। সুযোগ পাইলে তাহাকে বিনাশ করিয়া তাহার মাংস ভোজন করিতে পারিলেই পরম পরিতুষ্ট হয়। উহাদের মধ্যে এক দ্বীপবাসিগণের সহিত অপর দ্বীপবাসিগণের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, যাহারা মৃত হইয়া পতিত হয় তাহাদের যাহারা সংগ্রহ করিতে পারে তাহারাই ভক্ষণ করে। বিজেতৃগণ বিজিতদিগের মধ্যে যতগুলি ধরিতে পারে, তাহাদের আনয়ন করিয়া কারারুদ্ধ করিয়া রাখে এবং ক্রমে ক্রমে তাহাদের বিনাশ করিয়া মহানন্দে মাংস ভোজন করিয়া থাকে। ইয়ুরোপীয়গণ এইরূপ অসভ্য মনুষ্যদিগের মধ্যে অনেকগুলি আনয়ন করিয়া শিক্ষিত ও সুসভ্য করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। ইহারা কহে কৃষ্ণবর্ণ মনুষ্য অপেক্ষা শুক্লবর্ণ অধিক সুস্বাদু এবং ফরাসী অপেক্ষা আবার ইংরাজ অধিকতর মিষ্ট লাগিয়া

থাকে। রামায়ণে যে লঙ্কাবাসী রাক্ষসের উল্লেখ আছে, তাহা নিশ্চয়ই ঐ প্রকার মনুষ্য। পূর্ব্বে অবশ্যই লঙ্কা ও অপরাপর দ্বীপে তদ্রূপ মনুষ্য বাস করিত তাহার সন্দেহ নাই।

সংযুক্ত যমজ।

ইটালির অন্তর্গত টিউরিন্ নামক স্থানে এণ্টোনিয়া নাম্নী উনবিংশতিবর্ষ বয়স্কা এক নারী ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই এক অপূর্ব্ব
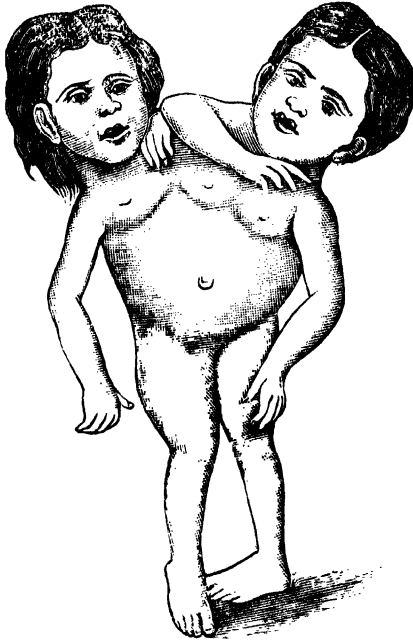
যমজ সন্তান প্রসব করেন। দুইটী সন্তানই পরস্পর এরূপে সংযুক্ত যে উভয়ের পদ ও উদর এক, কেবল মস্তক ও হস্ত ভিন্ন ভিন্ন। উপরের

চিত্রে দৃষ্টিপাত করিলে উহাদের আকৃতি অনুভূত হইবে। যদিও উহাদের উদর ও হৃদয় সংযুক্ত, তথাপি উহাদের পৃথক্ পাকস্থলী, পৃথক্ হৃৎপিণ্ড ও পৃথক্ ফুস্‌ফুস্ যন্ত্র আছে। ত্রিশ দিনে তাহাদের ওজন প্রায় দেড়সের হইয়াছিল। তাহাদের প্রাণ ভিন্ন ভিন্ন; একজন নিদ্রিত হইলে অপরে জাগরিত থাকে এবং একজনের ক্ষুধা উপস্থিত হইলে অপরের যে ক্ষুধা হইবে তাহা নহে। একটী মুখ যখন আহারার্থ ব্যগ্র হইতে থাকে, তখন হয়তো অপরটী নিদ্রায় অচেতন থাকে। তাহারা দাঁড়াইতে পারে, কিন্তু চলিতে পারে না; কারণ একখানি পদ বিকলাঙ্গ। উহাদের গৃহে উহারা অধিকাংশ সময় ঘরের মেজের উপর হামাগুড়ি দিয়া বেড়ায়। তাহারা আপনা আপনি বস্ত্র পরিধান করিতে পারে ও তাহা খুলিতে পারে। পীড়া সম্বন্ধেও উহাদের পরস্পর ঐক্য নাই; একজনের সর্দ্দি হইলে অপরের হয়তো তখন উদরাময় উপস্থিত হয়।

আমেরিকায় ব্রেজিল দেশে দুইটী সংযুক্ত যমজ কন্যা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এক্ষণে উহাদের বয়স বার বৎসর। উহাদের সমস্তই পৃথক্, কেবল উভয়ের উদর পরস্পর সংযুক্ত হওয়ায় তাহারা পরস্পর সম্মুখীন হইয়া অবস্থিতি করে।

কুক্কুরবদন মনুষ্য।

রুসিয়া দেশে ইয়োজা নামক এক যুবক আছে; ইহার মুখভাগ মাষ্টিফ্ জাতীয় কুক্কুরের তুল্য, কিন্তু অবশিষ্ট সমস্ত অবয়ব মনুষ্যের ন্যায়। এই ব্যক্তি মনুষ্যের মত বুদ্ধি ধারণ করে ও মনুষ্যের মত সকল কার্য্যই করিয়া থাকে, কিন্তু কোন কোন বিষয়ে কুক্কুরবৎ প্রবৃত্তি দেখা যায়। ইহার মুণ্ড আচ্ছাদিত থাকিলে লোকে ইহাতে যে কিছু অদ্ভুতত্ব আছে তাহা অনুভব করিতে পারে না, কিন্তু মুণ্ড ব্যতীত অপরাপর অবয়ব যদি দর্শকের দৃষ্টিগোচর না হয়, তাহা হইলে সে

নিশ্চয়ই মনে করিবে এক বৃহৎ কুকুর তদুপরি আক্রমণ করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছে।

সলাঙ্গুল মনুষ্য।

বিলাতে ডারউইন নামক এক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত ছিলেন। তিনি অনেক নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে প্রধান এই যে, তাঁহার মতে মনুষ্যজাতি পূর্ব্বে একপ্রকার বানর ছিল। ক্রমে সভ্য হইয়া মনুষ্য বর্ত্তমান আকারে পরিণত হইয়াছে। তিনি কহেন, মনুষ্যেরও পূর্ব্বে লাঙ্গুল ছিল, কালক্রমে ভিন্নপ্রকার জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় অবলম্বন করায় তাহাদের লাঙ্গুলের প্রয়োজন রহিত হয় এবং তজ্জন্যই ক্রমে তাহাদের লাঙ্গুল হ্রস্ব হইতে থাকে ও অবশেষে অদৃশ্য হয়। কিন্তু অনেকেই ডারউইনের মতগ্রহণে অনভিলাষী, কারণ কেহই আপনাকে বানরের বংশোৎপন্ন বলিয়া পরিচয় দিতে ইচ্ছুক নহে। কিন্তু সম্প্রতি একপ্রকার মনুষ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, যাহাদের বাস্তবিকই লাঙ্গুল বিদ্যমান আছে। নিম্নে তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইল।

কর্ণেল ডিউ করেট্ নামক এক ফরাসী পর্য্যটক ফ্রান্স্ দেশীয় এক বিজ্ঞান সমিতিতে সলাঙ্গুল মনুষ্য সম্বন্ধে এক বিবরণ প্রেরণ করেন, তাহার সার মর্ম্ম এই :—"১৮৪২ খৃষ্টাব্দে আমি মক্কা নগরে অবস্থিতি করিতেছিলাম; তথায় এক আমীরের সহিত আমার বিশেষ বন্ধুত্ব হইয়াছিল। অধিকাংশ সময় আমি উক্ত আমীরের বাটীতেই অতিবাহিত করিতাম। একদা নানা কথা প্রসঙ্গে আমি কহিলাম যে গিলানি জাতীয় মনুষ্যগণের নাকি লাঙ্গুল থাকে, কিন্তু ইয়ুরোপীয়গণ সে কথা বিশ্বাস করে না। আমীর একটু হাসিয়া কহিলেন, ঐরূপ আমার এক ভৃত্য আছে; এবং তিনি উক্ত ভৃত্যকে আমাদিগের নিকট আসিতে আদেশ করিলেন। এই ভৃত্য আমীরের এক ক্রীতদাস,

ইহার নাম বেল্ললি; তাহার বয়স তখন ত্রিশ বৎসর বলিয়া বোধ হইল। এই ব্যক্তির একটী লাঙ্গুল ছিল এবং সে উক্ত জাতীয় মনুষ্য। সে আরব্য ভাষায় কথা কহিতে পারিত এবং মুখমণ্ডল দর্শনে বুদ্ধিমান্ বলিয়া বোধ হইয়াছিল।

"ঐ ব্যক্তি আমায় কহিয়াছিল, যে তাহাদের দেশ অনেক দূরে অবস্থিত, এবং তাহাদের ভাষাও ভিন্নরূপ। তাহাদের সংখ্যা ৩০০০০ হইতে ৪০০০০; তাহারা সূর্য্য চন্দ্রাদির পূজা করিয়া থাকে এবং নরমাংস তাহাদের পরম উপাদেয় খাদ্য। কিন্তু এই ব্যক্তি মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল এবং উক্ত তীর্থ স্থানে ১৫ বৎসর বাস করিতেছে। তাহার আকৃতি পাত্‌লা, কিন্তু কার্য্যতৎপর ও বলশালী। তাহার গাত্রের বর্ণ তাম্রের ন্যায়, এবং গাত্র স্পর্শ করিলে মখমলের ন্যায় বোধ হয়। উহার পদতল লম্বা ও চেপ্‌টা; হস্ত ও পদ ক্ষীণ কিন্তু তাহাতে বিলক্ষণ বল আছে। উহার পঞ্জর সহজেই গণনা করা যায়; মুখমণ্ডল কদাকার; মুখগহ্বর বৃহৎ; ওষ্ঠাধর স্থূল; দন্ত সুদৃঢ়, তীক্ষ্ণ ও অত্যন্ত শুভ্র; নাসিকা প্রশস্ত ও চেপ্‌টা; কর্ণদ্বয় দীর্ঘ ও বিকৃত; কপাল ক্ষুদ্র ও বসা; কেশ যদিও ঘন নয়, তথাপি কোঁকড়ান। তাহার দাড়ি ও গোঁফ ছিল না এবং গাত্রে লোম ছিল না। সে অত্যন্ত কার্য্যক্ষম ও কষ্টসহ; সে দৈর্ঘ্যে পাঁচ ফুট্। তাহার লাঙ্গুল চারি ইঞ্চি দীর্ঘ এবং বানরের লাঙ্গুল তুল্য নমনশীল। এই ব্যক্তির স্বভাব ভাল; সে অত্যন্ত প্রভুভক্ত।"

শ্মশ্রুলা নারী।

কোন কোন স্ত্রীলোকের দাড়ি ও গোঁফ উৎপন্ন হয়, কিন্তু তাহা এত বিরল যে উহা এক অদ্ভুত দৃশ্য তাহার সন্দেহ নাই। জেন্স্‌ নাম্নী এক ফরাসী রমণীর শ্মশ্রু এরূপ দীর্ঘ যে, অনেক পুরুষেও সেরূপ শ্মশ্রু

লাভ করিতে অভিলাষ করিয়া থাকেন। এই স্ত্রীলোকটী দন্তশূলরোগের ভান করিয়া সর্ব্বদাই একখানি কাল রুমাল দ্বারা গণ্ড ও চিবুক আচ্ছাদন করিয়া রাখেন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে পঞ্জাবান্তর্গত কুঞ্জপুর নামক স্থানে এক নারী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; ইহাঁর বিবাহ ও সন্তানাদিও হইয়াছিল। ইনি যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হন তখন ঘন ও দীর্ঘ শ্মশ্রু উৎপন্ন

হইয়াছিল। যশোহর জেলায় মালাই নগর পোষ্টের অধীন রাজাপুর গ্রামে নাপিত জাতীয় এক গৃহস্থ মহিলার শ্মশ্রু আছে। ইনি যথা নিয়মে ক্ষৌর কার্য্যে বদন পরিষ্কৃত রাখেন। সময়ে সময়ে কলিকাতায়ও শ্মশ্রুলা নারী আসিয়া থাকে। বাজীকরেরা ৫ পয়সা দর্শনী লইয়া দেখাইয়া থাকে।

অদ্ভুত বৃক্ষলতাদি।

গোপাদপ ও নবনীতবৃক্ষ।

পরম কারুণিক পরমেশ্বর জগতের নানাস্থানে যেমন নানারূপ জীব সৃষ্টি করিয়াছেন তদ্রূপ এই জগতে মানবের হিতার্থে যে কত-প্রকার অদ্ভুত বৃক্ষ লতাদির সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। দক্ষিণ আমেরিকায় একপ্রকার অদ্ভুত বৃক্ষ জন্মে;

ইহার স্কন্ধ দেশে ছিদ্র করিলে শ্বেতবর্ণ যে রস নির্গত হয় তাহাতে দুগ্ধের সমস্ত গুণই বর্ত্তমান থাকে। বর্ণ, আস্বাদ ও পুষ্টিকারিতা সম্বন্ধে উহা দুগ্ধ হইতে সম্পূর্ণ অভিন্ন বলিয়া বোধ হয়। তদ্দেশীয় লোকেরা প্রতিদিন প্রাতঃকালে উক্ত বৃক্ষ হইতে দুগ্ধ সংগ্রহ করিয়া আনে। ঐ বৃক্ষের কোমল ত্বক্ হইতে এক প্রকার সুখাদ্য রুটী প্রস্তুত হয়। উক্ত বৃক্ষ গোটাকতক করিয়া প্রত্যেক গৃহস্থ যদি রোপণ

করেন তাহা হইলে বিনাব্যয়ে দুগ্ধ ও রুটীর সংস্থান হয়। কিন্তু ভগবানের এমনি আশ্চর্য্য মহিমা যে, সকল বৃক্ষ সকল দেশে উৎপন্ন হয় না। যদি উহা আমাদের দেশে জন্মাইত তাহা হইলে ঘোষ-বংশের দর্প চূর্ণীকৃত হইতে পারিত। আবার তদ্দেশে অপর একপ্রকার বৃক্ষ জন্মে, তাহার ফলমধ্যে নবনীত উৎপন্ন হয়। এই ফলের শাঁস শুষ্ক করিয়া রাখে, যখন প্রয়োজন হয় জলে সিক্ত করিলেই সদ্যজাত নবনীত তুল্য স্বাদ ও গুণ লাভ করে।

পিষ্টক বৃক্ষ ও তৈল তরু।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় সোসাইটী প্রভৃতি দ্বীপে একপ্রকার বৃক্ষ জন্মে, উহাকে পিষ্টক বৃক্ষ কহিয়া থাকে। এরূপ কহিবার কারণ এই, ইহার ফলের অভ্যন্তরে একপ্রকার শুভ্র পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহা পিষ্টকের ন্যায় সুস্বাদু। যে সকল স্থানে ঐ সকল বৃক্ষ উৎপন্ন হয় তথাকার অধিবাসীদিগের ঐ ফলই প্রধান জীবিকা। বৎসরের মধ্যে আটমাস ঐ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ ফল দেখিতে প্রায় বেলের মত। উক্ত

বৃক্ষের ফলেতেই যে কেবল অদ্ভুতত্ব আছে তাহা নহে, উহার ত্বকে একপ্রকার বস্ত্র প্রস্তুত হয় এবং পত্রেও গাত্রমার্জ্জনী ও গাত্রাবরণ প্রস্তুত হইয়া থাকে। অতএব দেখা যায় যে, একমাত্র বৃক্ষ রোপণে অন্ন বস্ত্র উভয় ক্লেশই নিবারণ হয়।

আফ্রিকা দেশে তৈল তরু উৎপন্ন হয়; এই অদ্ভুত বৃক্ষের রসে তৈলের সমস্ত গুণ বর্ত্তমান থাকে। অবশ্য তৈল মাত্রই উদ্ভিজ্জ, তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু সর্ষপাদি হইতে বহু কষ্টে তৈল সংগ্রহ করিতে হয়; এপ্রকার বৃক্ষ হইতে তৈল অতি সহজেই লাভ করা যায়।

পান্থপাদপ ও বর্ষণ বৃক্ষ।

আফ্রিকার নিকটবর্ত্তী মাদাগাস্কার দ্বীপে কদলী জাতীয় একপ্রকার উদ্ভিদ্ জন্মে, তাহার মধ্যে প্রচুর জল প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই বৃক্ষে কোন ফল উৎপন্ন হয় না, কিন্তু প্রত্যেক পত্র বা শাখার মূলভাগে এমন এক স্থান থাকে যে তথায় আঘাত করিবা মাত্র প্রচুর বারি-ধারা পতিত হইতে থাকে। ঐ জল সুস্বাদু, সুতরাং পথিকগণ তৃষ্ণার্ত্ত হইলে উক্ত বৃক্ষ হইতে বারি প্রাপ্ত হইয়া অনায়াসেই পিপাসা শান্ত করিতে পারে। পথিকদিগের বিশেষ সুবিধা বলিয়া ইহার নাম হইয়াছে পান্থপাদপ।

আবার আটলাণ্টিক মহা-সাগরান্তর্গত কানারিদ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত ফেরো নামক দ্বীপে এরূপ এক বৃহদাকার বৃক্ষ উৎপন্ন হয় যে প্রতিদিন রাত্রিতে উহা হইতে প্রচুর পরিমাণে বারিবর্ষণ হইয়া থাকে। ঐ দ্বীপে কখনই বৃষ্টি পতিত হয় না, কিন্তু উক্ত বৃক্ষ হইতে এত জল নির্গত হয় যে তাহা বৃক্ষতল হইতে স্রোতের ন্যায় গমন পূর্ব্বক সন্নিহিত ক্ষেত্র বিলক্ষণ আর্দ্র করে; ইহাতেই তদ্দেশে শস্য উৎপন্ন হয়। এই দ্বীপে পূর্ব্বে অসভ্য জাতির বাস ছিল, তাহারা কূপ তড়াগাদি খনন করিতে জানিত না; সেস্থানে যদি উক্ত রূপ বৃক্ষ না জন্মাইত তাহা হইলে নিশ্চয়ই তথায় জীবমাত্র বাস করিতে পারিত না। এই বৃক্ষকে বর্ষণ তরু কহিয়া থাকে; ইহা

অত্যন্ত সারবান্ বৃক্ষ এবং উচ্চতায় ৪০।৫০ ফুট পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ইহার পত্রের বহির্ভাগ নীলবর্ণ ও অভ্যন্তর ভাগ শুভ্র বর্ণ। দিবসে এই সকল পত্র যেন সূর্য্যকিরণে অর্দ্ধশুষ্কভাবে অবস্থিতি করে; রাত্রিকালে জলবিন্দু সমূহ ইহার পার্শ্বভাগ হইতে নিঃসৃত হইতে থাকে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, প্রতিদিন রাত্রিকালে প্রত্যেক বৃক্ষের শিরোভাগে আকাশ মধ্যে এক এক খণ্ড মেঘ দেখা যায়। কিন্তু অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঐ মেঘ হইতে জলবর্ষণ না হইয়া বৃক্ষের গাত্র হইতে ঘর্ম্মধারার ন্যায় জলধারা পতিত হইতে থাকে। এক একটা বৃক্ষ হইতে এত জল নিঃসৃত হয় যে শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। প্রত্যেক বৃক্ষ রাত্রিকালে বিশহাজার টন জলবর্ষণ করিয়া থাকে। এই বৃক্ষ উক্ত দ্বীপে স্থানে স্থানে দুই চারিটা করিয়া অবস্থিতি করে, কিন্তু তাহাতেই এত জলবর্ষণ হয় যে তদ্দ্বারা ১৫০ মাইল পরিধিবিশিষ্ট স্থানের মনুষ্য ও পশ্বাদি সকল জীবেরই নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। জ্যাক্সন্ নামক এক সাহেব স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়া এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন এবং কহিয়াছেন যে "আমি স্বচক্ষে না দেখিলে কেবল শ্রবণ মাত্র করিয়া উক্ত বৃক্ষের এরূপ প্রচুর বারিবর্ষণ শক্তি কখনই বিশ্বাস করিতে পারিতাম না।" দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্গত পেরুদেশের ময়বম্বা নগরেও বর্ষণবৃক্ষ জন্মিয়া থাকে। তথায় গ্রীষ্ম কালে যখন নদী সরোবরাদি শুষ্ক হইয়া যায় তখনই উক্ত বৃক্ষ হইতে প্রচুর বারিবর্ষণ হইয়া থাকে। পরমেশ্বরের কি আশ্চর্য্য মহিমা !!!

মনুষ্যাকৃতি মূল।

শালগাম, গাজর প্রভৃতি মূলকজাতীয় পদার্থে সময়ে সময়ে অদ্ভুত আকার দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। নিম্নভাগে যে তিনটী মূলের চিত্র প্রদত্ত হইল, তাহারা উদ্ভিদ্ রাজ্যে অদ্ভুত পদার্থ বলিতে হইবে। যে সমস্ত

পুস্তক—সর্ব্বজনের বিশ্বাসভাজন সেই সকল পুস্তক হইতে ইহা সংগৃহীত হইয়াছে, সুতরাং ইহাতে কিছুমাত্র মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত নাই।

১৬২৮ খৃষ্টাব্দে জর্ম্মানিদেশে উইডান নামক গ্রামে এরূপ এক শালগাম উৎপন্ন হয় যে তাঁহার আকৃতি মনুষ্যের ন্যায়। এতৎ মূল-

সম্বন্ধে যদি কেহ পুরাতন বিবরণী পাঠ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তিনি ১৬৭০ খৃষ্টাব্দের "মিস্‌লেনিয়া একাডেমি নেচুরি" নামক গ্রন্থের ১৩৯ পৃষ্ঠায় তাহা প্রাপ্ত হইবেন। উক্ত শালগামের পত্রগুলি কেশগুচ্ছ তুল্য; উহার অধোভাগের গোলাকার অংশে মনুষ্যের মত স্পষ্ট চক্ষু, নাসিকা ও ওষ্ঠের চিহ্ন বর্ত্তমান। হস্তদ্বয়, পদদ্বয় এবং বক্ষঃস্থলের মত সমস্ত অংশই উহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। সমস্ত অবয়ব যেন স্ত্রীলোকের ভাব। কি আশ্চর্য্য !!!

দ্বিতীয়চিত্রে যে মূলকের অবয়ব প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা হার্লেম্-প্রদেশে উৎপন্ন হইয়াছিল এবং জাকোব্ পিনয় নামক এক প্রসিদ্ধ

চিত্রকর কর্ত্তৃক যথাযথ চিত্রিত হইয়াছিল। এই চিত্রকরের বন্ধু জফর্-বেকার ১৬৭২ খৃষ্টাব্দে চিত্রখানি গ্রান্ডর্পকে উপহার প্রদান করেন। তিনি কবিনামক বিখ্যাত ভাস্কর দ্বারা উহার আকৃতি প্রস্তরে খোদিত করাইয়াছিলেন। উক্ত খোদিত আকৃতি অনুসারেই আমাদের চিত্র প্রস্তুত হইয়াছে।

১৮০২ খৃষ্টাব্দে বার্মিংহাম্ নগরের মিউজিয়ম্ অধ্যক্ষ বিসেট্ সাহেব এরূপ এক মূলক প্রাপ্ত হন যে তাহা অবিকল মনুষ্য হস্তের ন্যায়।

তিনি বলিয়াছিলেন যে এই মূলকে অঙ্গুলিগুলি সম্পূর্ণাবয়ব; তিনি উক্ত মূলকের অধিকারীর নিকট হইতে উহা ক্রয় করিয়া লইবার জন্য অনেক অর্থ দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু সে বিক্রয় করিতে সম্মত হয় নাই।

তৃতীয় চিত্রে যে মূলকের আকৃতি প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে মনুষ্যহস্তের পৃষ্ঠভাগ এমন সুন্দরভাবে প্রকৃতি কর্ত্তৃক অনুকৃত হইয়াছে যে নিপুণ চিত্রকরও উহা অপেক্ষা সুন্দর গঠন অঙ্কিত করিতে পারে না। এই মূলকটী এক বিক্রয়কারিণী বাজারে বিক্রয় করিতে আসিয়াছিল এবং বহুলোকের হস্তগত হইবার পর অবশেষে এক ভাস্করের হস্তে পতিত হয়। তিনি উহা খোদিত করিয়া প্রচার করেন। ডাক্তার মেঞ্জেল কহিয়াছেন, যে তিনি ঠিক্ মনুষ্যাকৃতি এক মূলক দেখিয়াছেন, কিন্তু তাহার কোন চিত্রাদি নির্ম্মিত হইয়াছিল কি না, তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার বাজারে একটী অপূর্ব্ব মূলক দৃষ্ট হইয়াছিল। তাহা অন্যূন দুই হস্ত দীর্ঘ এবং মনুষ্য দেহের কটিদেশ হইতে সমস্ত নিম্নভাগের প্রতিকৃতি অতি সুন্দর ভাবে ব্যক্ত হইতে ছিল।

বিষবৃক্ষ ও ক্ষুধাহরবৃক্ষ।

বিষবৃক্ষ অনেক প্রকার আছে; উহাদের বিষ এত উগ্র যে, সর্পবিষতুল্য মুহূর্ত্তমধ্যে জীবের প্রাণনাশ করিতে পারে। আবার সর্ব্বাপেক্ষা জাট্রোফানামক বিষবৃক্ষ তীক্ষ্ণতম বিষ ধারণ করিয়া থাকে। ইংলণ্ডে কিট নামক স্থানের বোটানিকাল গার্ডেন অর্থাৎ উদ্ভিদ্‌বিদ্যা-বিষয়ক উদ্যানে একটী জাট্রোফাগুল্ম রোপিত হইয়াছিল। একদা উক্ত উদ্যানের অধ্যক্ষ স্মিথ্ সাহেবের উক্ত গুল্মের নিকট দিয়া যাইবার সময়, তাঁহার হস্তের পৃষ্ঠদেশে উহার অতি সূক্ষ্মাগ্র কণ্টক কিঞ্চিৎ স্পৃষ্ট মাত্র হইয়াছিল। ইহাতেই তিনি সহসা এরূপ অসুস্থ হইয়া পড়িলেন যে তাঁহার চৈতন্য লোপ হইল ও রক্তের গতাগতি বন্ধ হইয়া গেল। সৌভাগ্যের বিষয় বিষ ততটা প্রবেশ করিতে পারে নাই, তাই ডাক্তার আসিয়া বহুকষ্টে তাঁহাকে আরোগ্য করিতে পারিয়াছিলেন। কি ভয়ঙ্কর বিষয়! সামান্য একটী কণ্টক হস্তে কেবল স্পর্শমাত্র করিয়াছিল; বিদ্ধও করে নাই, রক্তপাতও হয় নাই, কিন্তু তাহাতেই এক বলবান্ ব্যক্তির জীবন বিনষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছিল। এরূপ বৃক্ষ রোপণ করিলে সর্ব্বদাই অনিষ্টের আশঙ্কা, এই কারণে বোধ হয় উদ্যানরক্ষকগণ কৌশল পূর্ব্বক বিনষ্ট করিয়া ফেলে, তাই জাট্রোফা ইংলণ্ডের কোন উদ্যানে আর দেখা যায় না।

দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্গত পেরুদেশে এরূপ এক অদ্ভুত বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, যে তাহার আশ্চর্য্য ক্ষুধা রোধিণী শক্তি শুনিলে বাস্তবিক বিস্মিত হইতে হয়। পক্ক হরিতকী ভক্ষণে ক্ষুধা তৃষ্ণা কিছুই থাকে না, এরূপ এক প্রবাদ এদেশে প্রচলিত আছে, কিন্তু পেরুদেশীয় উক্ত বৃক্ষের গুণ প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। এম্ ডি রোসি নামক এক সাহেব নিজে পরীক্ষা করিয়া উহা প্রচার করেন। তিনি কহেন পঞ্চাশ রতি পরিমিত

উক্ত বৃক্ষের ডাঁটা সিদ্ধ করিয়া সেই জল পান করায় ৪৮ ঘণ্টা ক্ষুধা ও তৃষ্ণা কিছুই ছিল না; এবং অনাহার জন্য শরীরও দুর্ব্বল হয় নাই।

বৃহদাকার বৃক্ষ ও দীর্ঘায়ু বৃক্ষ।

উত্তর আমেরিকার অন্তর্গত কালিফর্ণিয়াদেশে অরণ্যমধ্যে যেরূপ বৃহদাকার বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, পৃথিবীর আর কুত্রাপি সেরূপ দেখা যায় না। অধ্যাপক স্মাইথ সাহেব উক্তরূপ একটী বৃক্ষ পরিমাণ করিয়া দেখিয়াছেন; সেটীর উচ্চতা ১৮০ হস্তেরও উপর; অনেক দূর অন্তর হইতে উহার শিরোভাগ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ঐ বৃক্ষের স্কন্ধদেশের পরিধি, ভূমি হইতে আড়াই হাত উর্দ্ধে পরিমাণ করিলে, সত্তর হস্ত হয়। অতএব, কুড়িজন দীর্ঘাকার ব্যক্তিও হাত ধরাধরি করিয়া উহাকে বেষ্টন করিতে পারে না। এই বৃক্ষের স্কন্ধদেশ কর্ত্তন করিয়া শূন্য-গর্ভ করিলে তন্মধ্যে ২৭ হাত দীর্ঘ ও ২৭ হাত প্রস্থ, এমন এক সুবৃহৎ গৃহের স্থান অনায়াসেই সঙ্কুলান হয়। উক্ত কোটর সভাগৃহরূপে সজ্জিত করিলে তাহাতে ৩৬০জন সভ্য অক্লেশে উপবেশন করিতে পারে।

টেনেরিফ পর্ব্বতের পাদদেশে আরোটেভা নামক স্থানে "ড্রাগন্" নামে একপ্রকার বৃহদাকৃতি বৃক্ষ জন্মাইয়া থাকে। হম্‌বল্‌ট্ নামক বিখ্যাত প্রাচীন ঐতিহাসিক কহেন যে উহার এক একটার বয়স ছয় সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। সর্‌জন্ হার্শেল্ অনুমান করিয়া গিয়াছেন যে উক্ত বৃক্ষ সমূহের মধ্যে একটীর বয়স পৃথিবীস্থ অপর সমস্ত তরু অপেক্ষা অধিক। অপরাপর লেখকগণ এই বৃক্ষটীকে এতই পুরাতন মনে করেন যে পৃথিবী মনুষ্যের বাসযোগ্য হইবার পূর্ব্ব হইতেই উহার বিদ্যমানতা আছে, এরূপ বর্ণনা করিয়া থাকেন। ঐ বৃক্ষের স্কন্ধ দেশে এমন বৃহৎ কোটর উৎপন্ন হইয়াছিল, যে শত শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে ঐ কোটর গুয়াঞ্চি জাতির ভজনালয়রূপে ব্যবহৃত হইত।

পর্ত্তুগীজ্‌গণ উক্ত স্থান অধিকার করিলে তাহারা উক্ত কোটরকে উপাসনামন্দির বা গির্জ্জাবাড়ীরূপে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে এই বৃক্ষের এক বৃহৎ শাখা ভগ্ন হইয়া যায়; সেই অবধি বৃক্ষটী ক্রমে অন্তিম দশায় অগ্রসর হইতে থাকে। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে পোর্টো সাণ্টোদ্বীপে প্রবল ঝটিকা আগমন করিয়া অত্যন্ত ক্ষতি করে; সেই সময় বৃক্ষটী ভূমিসাৎ হয় এবং সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়া যায়।

দীপতরু ও জম্বীর তৃণ।

ভারতবর্ষে হিমালয় পর্ব্বতের অন্তর্গত স্থান বিশেষে প্রকৃত দীপতরু জন্মিয়া থাকে। অন্ধকার রজনীতে এইবৃক্ষ হইতে আলোক নির্গত হইয়া সন্নিহিত সমস্ত স্থান আলোকময় করিয়া থাকে। এই বৃক্ষের প্রত্যেক অংশ এমনকি মূল পর্য্যন্ত আলোক-দায়িকা শক্তি ধারণ করে। যখন কতকগুলি উক্তপ্রকার বৃক্ষ একত্র থাকিয়া রজনীতে আলোকময় হয়, তখন উহার যে কি আশ্চর্য্য শোভা সমুৎপন্ন হয় তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। দেখিলে বোধ হয় যেন বৃক্ষসকলে অগ্নি লাগিয়াছে, কিন্তু বাস্তবিক উক্ত আলোকে কোন তাপ

অবস্থিতি করে না। মেজর ম্যাডেন্ এই বৃক্ষ সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ এক ইংরাজী কৃষিপত্রিকায় প্রকাশ করেন। তিনি কহেন, তাঁহার একজন দেশীয় ভৃত্য কার্য্যবশতঃ শৈলমধ্যস্থ জঙ্গলে গমন করিয়াছিল; ফিরিয়া
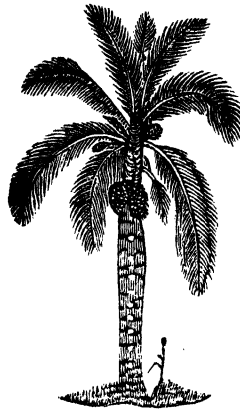
আসিতে সন্ধ্যা হইল, আগমন কালে বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায় সে এক গুহা মধ্যে আশ্রয় লয়। তথায় থাকিয়া সে পূর্ব্বোক্ত অপূর্ব্ব বৃক্ষ দেখিতে পায়। তাহার মুখে উক্ত বিবরণ শ্রবণ করিয়া মেজর তাহার যাথার্থ্য অনুসন্ধান ও নির্ণয় করিয়াছেন। হিন্দুগণ অনেক দিন হইতেই এই বৃক্ষের সত্তা অবগত ছিলেন; এই তরুকে ওষধি কহিয়া থাকে। মহাকবি কালিদাসের গ্রন্থে এই উদ্ভিদের অনেক বার উল্লেখ আছে। বেদে এরূপ কথিত আছে যে সূর্য্য, অগ্নি ও ওষধিতে তেজ রাখিয়া অস্তগমন করেন।

সিংহলদ্বীপে কাণ্ডির নিকটবর্ত্তী পার্ব্বত্য প্রদেশে এক প্রকার আশ্চর্য্য তৃণ জন্মিয়া থাকে। ইহা ছয় সাত হস্ত দীর্ঘ হয়; ইহার পত্র মর্দ্দিত করিলে জম্বার ফলের ন্যায় গন্ধ বাহির্গত হয় এবং আস্বাদেও ইহা অত্যন্ত অম্ল। এই পর্য্যন্তই যে ইহার অদ্ভুতত্ব তাহা নহে। বর্ষাকালে যখন বারিবর্ষণ হইতে থাকে তখন এই তৃণের বন স্বতই প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। ইহাতে এত আলোক ও ধূমোৎপত্তি হয় যে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য সমুপস্থিত হইয়া থাকে। প্রজ্জ্বলনকালে এমন এক প্রকার শব্দ নির্গত হইতে থাকে যে বহুদূর হইতেও তাহা শ্রুতিগোচর হয়। এইরূপে সমস্ত বন দগ্ধ হইয়া গেলে, যখন সমস্ত স্থান কৃষ্ণ বর্ণ দেখাইতে থাকে, তখন বোধ হয় যে উক্ত তৃণকুল একেবারেই বিনষ্ট হইয়া গেল; কিন্তু দিন কয়েক পরেই দেখা যায় যে নূতন তৃণসমূহ বহির্গত হইয়া পুনর্ব্বার সমগ্র স্থান আচ্ছাদিত করিতেছে।

কম্পাসবৃক্ষ ও হস্তিদন্তবৃক্ষ।

আমেরিকায় মার্কিন্ রাজ্যে এরূপ একপ্রকার অদ্ভুত গুল্ম উৎপন্ন হয় যে তাহার পত্রাগ্র সর্ব্বদাই উত্তর দিকে এবং দক্ষিণ দিকে অন্তভাগ অবস্থিতি করিয়া থাকে। এই গুল্ম তিন ফুট হইতে ছয় ফুট পর্য্যন্ত দীর্ঘ হয় এবং এক প্রকার পীতবর্ণ পুষ্প উৎপাদন করিয়া থাকে। ইহার

পত্র সমূহ অপর বৃক্ষের পত্রের ন্যায় চিৎ হইয়া জন্মায় না, কা'ত ভাবে জন্মিয়া থাকে। একটী পত্রের অগ্রভাগ উত্তর দিকে থাকে এবং তদুপরিস্থ অপর পত্রটীর অগ্রভাগ দক্ষিণদিকে অবস্থিতি করে; এইরূপে সমস্ত পত্রই উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই তরুর এইরূপ অসাধারণ গুণ

থাকায় পথিকগণের দিঙ্‌নির্ণয় অতি সহজেই সম্পন্ন হইতে পারে। এই তরুর কাণ্ড হইতে এক প্রকার রঞ্জন প্রাপ্ত হওয়া যায়।

সচরাচর যে সমস্ত বোতাম, বাক্স ও অপরাপর দ্রব্য হস্তিদন্তনির্ম্মিত বলিয়া সাদরে ব্যবহার করা যায়, বাস্তবিক তাহার অধিকাংশ হস্তিদন্তে নির্ম্মিত নহে, তাহা এক প্রকার ফলের বীজ হইতে নির্ম্মিত। দক্ষিণ

আমেরিকার উত্তরাংশে তাল বা নারিকেল জাতীয় এক প্রকার বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে; ইহার কাণ্ড সরলভাবে উন্নত না হইয়া চিত্রে যেরূপ প্রদত্ত হইয়াছে তদ্রূপ ভূমির উপর শয়ানভাবে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ইহা দুই জাতীয় হয়; এক প্রকার বৃক্ষে ফল উৎপন্ন হয় ও অপর বৃক্ষে ফল উৎপন্ন হয় না। তালবৃক্ষের মধ্যে যেমন কতকগুলি ফলবান্ ও কতকগুলি ফলহীন হয়, ইহাও প্রায় সেইরূপ। উভয় প্রকার বৃক্ষেই অতি সুগন্ধ পুষ্প উৎপন্ন হয়; অফল বৃক্ষে তালের জটাতুল্য জটা বাহির হয়, তাহাতেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে। ফলোৎপাদক বৃক্ষের পুষ্প ভিন্ন প্রকার। ঐ সকল পুষ্পের এরূপ তীব্র সৌগন্ধ যে মক্ষিকাগণ সর্ব্বদাই বৃক্ষ পরিবেষ্টিত করিয়া থাকে।

এক একটী ফল যখন পরিণত হয় তখন ১২।১৪ সের পর্য্যন্ত ভারী হইয়া থাকে। ফলের উপরিভাগ কঠিন আবরণে আবৃত। এই ফলের ছয় কিম্বা সাতটি পৃথক্ ভাগ দৃষ্ট হয়, প্রত্যেক ভাগে ছয়টী হইতে নয়টী করিয়া বীজ উৎপন্ন হয়। এই বীজ যখন সুপক্ক হয় তখন ইহার মধ্যস্থলের বেড় ছয় ইঞ্চি হইয়া থাকে এবং উহা এত সুদৃঢ় ও শুভ্রবর্ণ হয় যে আসল হস্তিদন্ত তেমন সুন্দর দেখায় না। এই ফল ইংলণ্ডে বহুল পরিমাণ আমদানি হয় এবং তত্রত্য শিল্পকরগণ তাহা হইতে নানা প্রকার দ্রব্য নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। কএক বৎসরে ইংলণ্ডে প্রায় ৫০০০ মণ উক্ত বীজ আমদানি হইয়াছে। এই বীজ যখন অপক্ক থাকে তখন ইহার অভ্যন্তরভাগ কোমল মিষ্ট শাঁস ও সুস্বাদু জলে পরিপূর্ণ থাকে। একটী ফল ভগ্ন করিলে তন্মধ্য হইতে যে বীজ পাওয়া যায় তাহাতে তিন চারি জনের অনায়াসেই ক্ষুধা ও তৃষ্ণা নিবারণ হয়। যখন সুপক্ক হয় তখন বীজের সর্ব্বাংশ বজ্রবৎ কঠিন্ হয়, কিন্তু তন্মধ্যেই উহার অঙ্কুরোৎপাদিকা শক্তি বর্ত্তমান থাকে। যখন অঙ্কুরিত হইতে আরম্ভ হয় তখন অভ্যন্তরভাগ পুনর্ব্বার কোমল হইতে আরম্ভ হয়।

পতঙ্গভুক্ বৃক্ষ ও মাংসাশী তরু।

উদ্ভিদ্ সমূহ জল বায়ু ও মৃত্তিকা দ্বারাই স্বশরীর পরিপোষণ করে; কে কোথায় দেখিয়াছ যে উদ্ভিদ্ আবার মাংস ভোজন করিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়? কিন্তু ভগবানের কি আশ্চর্য্য মিহিমা! তিনি মাংসভুক্ তরুও সৃষ্টি করিয়াছেন। আমেরিকা ও আফ্রিকার স্থানে স্থানে এরূপ এক প্রকার ক্ষুদ্রাবয়ব বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মক্ষিকা ও পতঙ্গ সমূহই তাহাদের প্রধান আহার। এই বৃক্ষের কেমন এক

মোহিনী শক্তি আছে যে পতঙ্গাদি সমীপে আগমন করিলেই যেন মুগ্ধ হইয়া ইহার পত্রোপরি পতিত হয়। পতিত হইবামাত্র পত্রটি গুটাইয়া গিয়া একটী 'পত্রপুট নির্ম্মিত হয় এবং পতঙ্গটী তন্মধ্যস্থিত এক প্রকার রসে আর্দ্র হইতে থাকে। ঐ রস স্বতই পত্রের গাত্র হইতে নির্গত হয়। সংযুক্ত-পক্ষ হইয়া পতঙ্গ আর উড়িতে পারেনা; ক্রমে সেই রসে পতঙ্গটী গলিয়া যায় এবং পত্র মধ্যে পুনঃ শোষিত হইয়া থাকে। তৎপরে পত্রটী পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ বিস্তৃত হয়।

পতিত না হইয়া যদি কোন ক্ষুদ্র জড়পদার্থ দৈবাৎ পত্রমধ্যে আসিয়া পতিত হয়, তাহা হইলে পত্রটী তৎক্ষণাৎ গুটাইয়া তাহাকে ধৃত করে বটে, কিন্তু পরক্ষণেই তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া আবার পূর্ব্ববৎ বিস্তৃত হইয়া থাকে। অপর এক প্রকার বৃক্ষ আছে, তাহারা মক্ষিকাদি ধৃত করিয়া বিনাশ করে, কিন্তু ভক্ষণ করে না। ইহাকে ইংরাজীতে "ভেনাস্ ফ্লাই ট্রাপ্" কহিয়া থাকে; ইহার অর্থ "বাসন্তী দেবীর মক্ষিকাপাশ।" ইহার পত্রগুলি দেখিতে প্রায় পুষ্পের ন্যায়; ইহার দুই দিকে সূক্ষ্মাগ্রে কণ্টক শ্রেণীবদ্ধ হইয়া থাকে। ইন্দুর ধরিবার জন্য করাত-কল যেরূপ, উক্ত পত্রগুলি প্রায় তদ্রূপ। ভ্রমর, মধুমক্ষিকা প্রভৃতি পুষ্পবোধে উহার পত্রোপরি বসিবামাত্র পত্রটী মুদ্রিত হইয়া উভয়দিকস্থিত কণ্টক দ্বারা এরূপ আটকাইয়া ধরে যে উহারা আর পলায়ন করিতে পারে না। ক্রমে ভ্রমরাদি তন্মধ্যে থাকিয়া মরিয়া যায়; তখন পত্রটী স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তন করে।

আবার নিম্নলিখিত এক মাংসাশী তরুর বিবরণ পাঠ করিলে পরম বিস্ময়ার্ণবে নিমগ্ন হইতে হয়। একজনমাত্র লোকের বর্ণনামত এই তরুর বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে; তিনি স্বচক্ষে দর্শন করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু বৃক্ষটী স্বয়ং বিনষ্ট করিয়া আসায় অপর কাহাকেও দেখাইতে পারেন নাই। এই তরুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁহার বর্ণনা ভিন্ন অপর প্রমাণ নাই।

ওরিয়েল নামক এক পর্য্যটক মধ্যআফ্রিকার অরণ্য মধ্যে মৃগয়ার্থ ভ্রমণ করিতে করিতে এক বিশাল মাংসাশী বৃক্ষ অবলোকন করিয়াছিলেন। তিনি একটী হরিণকে গুলি করিলে, সে পলায়ন করিতে আরম্ভ করে। তিনি এক কাফ্রি বালক ভৃত্যকে উহার পশ্চাৎ ধাবমান হইতে আদেশ করেন। সে তদনুসারে তাহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলে, কিয়দ্দূর অন্তরে যাইয়া বালকটী চীৎকার করিতে আরম্ভ করে। ওরিয়েল তাহার কাতর কণ্ঠ শ্রবণে দ্রুতপদে তদভিমুখে গমন

করিতে লাগিলেন। তিনি দেখেন এক বৃহৎ বৃক্ষের শাখা সমূহ অত্যন্ত সঞ্চালিত হইতেছে। অনুমান করিলেন বালকটী বোধ হয় ঐ বৃক্ষ-তলেই গিয়াছে ; এই ভাবিয়া তিনি যেই অগ্রসর হইবেন অমনি দেখেন বৃক্ষটী শাখা সঞ্চালন করতঃ যেন তাঁহাকে ধৃত করিবার উপক্রম করিতেছে। তিনি পশ্চাতে সরিয়া আসিয়া অত্যন্ত বিস্ময়রসে নিমগ্ন হইলেন, এবং কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া হস্তস্থিত বন্দুক দ্বারা গুলি করত উহার শাখা সমূহ ক্রমে ক্রমে ভগ্ন করিলেন। সেই সময় বৃক্ষটা অত্যন্ত কম্পিত হইতে লাগিল। তখন ওরিয়েল ছুরিকাঘাতে বৃক্ষটিকে বিনষ্ট করিলেন। সেই সমস্ত শাখা সমূহের মধ্যে দেখা গেল যে পূর্ব্বোক্ত মৃগ ও বালকটী মৃত হইয়া শাখা মধ্যে এরূপে সংলগ্ন হইয়াছে যে তাহা হইতে উহাদের কোন ক্রমেই পৃথক্ করা গেল না। কাফ্রি বালকটীকে শাখা প্রশাখা সমেত সমাহিত করা হইল।

বৃহৎ পুষ্প ও বৃহৎ পত্র।

সুমাত্রা দ্বীপে "রাফেল্‌সিয়া আর্ণল্‌ডি" নামক এরূপ এক জাতীয় বৃহৎ পুষ্প জন্মিয়া থাকে যে, তদ্রূপ বৃহৎ পুষ্প পৃথিবীর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। আর্ণল্‌ড্ নামক এক সাহেব উহা আবিষ্কার করেন, এইজন্য তাঁহার নামানুসারে উহার পূর্ব্বোক্তরূপ নাম প্রদত্ত হইয়াছে। এই পুষ্পের পাঁচখানি করিয়া গোলাকার দল বা পাপ্‌ড়ি উৎপন্ন হয়, প্রত্যেক খানির প্রস্থ এক ফুট। এই পাপ্‌ড়ির বর্ণ ইষ্টকের মত লোহিত, কিন্তু মধ্যে মধ্যে পীতাভ উন্নত স্থান সমূহ ইহাতে দৃষ্টিগোচর হয়। মধ্যস্থলে, যথায় কর্ণিকা অবস্থিতি করে, তথায় দুই হস্ত পরিধি-বিশিষ্ট এক বাটির মত স্থান আছে, তাহা মাংসবৎ এক পিণ্ডাকার পদার্থে পরিপূর্ণ ; ইহার উপরিভাগে গোশৃঙ্গবৎ বক্র কেশর তুল্য পদার্থ সমূহ জন্মিয়া থাকে। উক্ত পিণ্ডাকার পদার্থ উঠাইয়া লইলে

যে শূন্যগর্ভ বাটির মত স্থান বাহির হয় তাহাতে প্রায় নয় সের জল ধরিতে পারে। এক একটা পুষ্প ওজনে প্রায় সাড়ে সাত সের হইয়া থাকে। ইহার পাপ্‌ড়ি অত্যন্ত পুরু, অর্দ্ধ ইঞ্চিরও অধিক বেধ দেখিতে পাওয়া যায়। এত বৃহৎ পুষ্প কিন্তু কোন বৃক্ষ বা লতা হইতে উৎপন্ন হয় না; বোধ হয় যেন ভূমি হইতে বহির্গত হইয়া থাকে। কিন্তু

বাস্তবিক এই পুষ্প পত্রশূন্য একপ্রকার কাণ্ড হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে; এই কাণ্ড ভূমির উপর লুণ্ঠিত হইয়া থাকে। পত্রশূন্য লতা ও পরিপাক যন্ত্রশূন্য প্রাণী উভয়েই সমান; সুতরাং উক্ত লতা কিরূপে জীবন ধারণ করে তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু এইরূপ

লতা অপর বৃক্ষের রস পান করিয়া বৃদ্ধি পায়। উক্ত আর্ণল্‌ডি লতা এক প্রকার বন্য দ্রাক্ষালতার গাত্রে উৎপন্ন হয় এবং ভূমিতলে লতাইয়া যায়। ঐ লতা হইতেই সহসা ওরূপ বৃহৎ পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে।

গন্ধদ্রব্য ব্যবসায়িগণ এরূপ বৃহৎ পুষ্পের নাম শুনিলে হৃষ্টচিত্ত হইতে পারেন এবং মনে করিতে পারেন এরূপ পুষ্প কয়েকটী সংগ্রহ করিতে পারিলে বহুল পরিমাণ আতর ও এসেন্স প্রস্তুত হইতে পারে। কিন্তু এই পুষ্পের গন্ধ আঘ্রাণ করিলে তাঁহারা একেবারে নিরাশ হইবেন। ইহার গন্ধ আছে বটে কিন্তু তাহা দুর্গন্ধ, মাংস পচিলে যেরূপ দুর্গন্ধ বাহির হয়, ইহাও তদ্রূপ। ভগবানের কি বিড়ম্বনা! দুর্গন্ধ পুষ্প আমাদের দেশেও জন্মিয়া থাকে। বর্ষাকালে ঘেঁটফুল জাতীয় যে সমস্ত ফুল ফুটে, তাহার কোনটার বিষ্ঠার মত ও কোনটার পচা মাংসের মত গন্ধ বাহির হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত রাফেলশিয়া আর্ণল্‌ডিকে কেহ কেহ ক্রুবল্‌ পুষ্প কহিয়া থাকে।

ভিক্টোরিয়া রিজিয়া নামক এক প্রকার পদ্মসদৃশ জলজ পুষ্প উৎপন্ন হয়, ইহার বেড এক গজেরও অধিক। এই পুষ্প যে লতা হইতে উৎপন্ন হয়, তাহার পত্র এত বৃহৎ যে তাহা সকলেরই বিস্ময় উৎপাদন করিতে পারে। এই পত্র পদ্মপত্রের ন্যায় গোলাকার ও জলে ভাসিয়া থাকে; এক একখানি পত্রের পরিধি দশ হাত পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছে। আমেরিকার উত্তর খণ্ডে এই লতার জন্মস্থান, তথায় এই পত্রের পরিধি বার হাত পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। একবার প্রায় অৰ্দ্ধমন ভার বিশিষ্ট এক শিশুকে একখানি পত্রের উপর সংস্থাপিত করা হইয়াছিল, ইহাতেও পত্রটী জলমগ্ন হয় নাই। এই পত্র অতি সত্বর বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, প্রতি ঘণ্টায় এই পত্রের ব্যাস অৰ্দ্ধ ইঞ্চি পর্য্যন্ত বৃদ্ধি লাভ করে।

অদ্ভুত প্রাকৃতিক দৃশ্য

আগ্নেয় পর্ব্বত।

পৃথিবীর স্থানে স্থানে এরূপ পর্ব্বত আছে যে তাহার শিখর দেশে গহ্বর বিদ্যমান থাকে; সময়ে সময়ে ঐ গহ্বর হইতে দ্রবীভূত গালা, গন্ধক, ভস্ম, কর্দ্দম, প্রস্তর-খণ্ড প্রভৃতি অতি প্রচণ্ড বেগে ভূরি পরিমাণে নির্গত হইতে থাকে। ইহাতে সন্নিহিত গ্রাম, নগর, শস্যক্ষেত্র প্রভৃতি একেবারে প্রোথিত ও বিনষ্ট হইয়া যায়। এইরূপ পর্ব্বতকে আগ্নেয় পর্ব্বত কহিয়া থাকে। স্থানান্তরে উক্ত হইয়াছে যে পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ তরল অগ্নিময় পদার্থ দ্বারা পরিপূর্ণ। সেই তরল অগ্নি উপরিস্থিত কঠিন আবরণের ভার প্রাপ্ত হইয়া সঞ্চালিত হইতে থাকে; ইহাতে এরূপ বেগ সমুৎপন্ন হয় যে তাহা গমনপথ প্রাপ্ত হইলেই পৃথিবীর উপরিভাগে উঠিয়া আইসে। অপরাপর কারণেও অভ্যন্তরস্থ তরলাগ্নির বেগ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। সেই বেগের সহিত তরলপদার্থ ভূরি পরিমাণে আগ্নেয় পর্ব্বত হইতে নিঃসৃত হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে আগ্নেয় গিরির শিখরস্থ গহ্বরের সহিত ভূগর্ভস্থ তরলাগ্নির পরস্পর সংযোগ আছে।

পৃথিবীর মানচিত্রে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে আগ্নেয় পর্ব্বত মহাদেশ সমুহের উপকূল অংশে ও সমুদ্রস্থ দ্বীপ মধ্যেই বহুল পরিমাণে অবস্থিতি করে; মহাদেশের অভ্যন্তর ভাগে আগ্নেয় পর্ব্বত পায়ই দৃষ্টি গোচর হয় না। মহাদেশের অভ্যন্তর ভাগে পূর্ব্বে আগ্নেয় পর্ব্বত ছিল, তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অনেক আগ্নেয় পর্ব্বত বহুকাল হইতেই অগ্ন্যুদ্গীরণ হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে এবং যে সকল আগ্নেয় পর্ব্বত অদ্যাপি ক্রিয়াবান্ আছে কালক্রমে তাহারাও নিষ্ক্রিয় হইতে পারে; আবার নূতন আগ্নেয় পর্ব্বতও সমুৎপন্ন হইতে পারে।

বিসুবিয়সে অগ্ন্যুৎপাত।

আমেরিকার কোটাপক্সি নামক আগ্নেয় গিরি অত্যন্ত উন্নত, এই জন্য তাহার শিখর দেশ চিরকাল বহুল পরিমাণ তুষার দ্বারা আবৃত থাকে। যখন উহা হইতে অগ্নিস্রোত নিঃসৃত হয় তখন উক্ত তুষার-রাশি দ্রবীভূত হইয়া প্রবল বেগে নিম্নদেশে অবতরণ করিতে থাকে; ইহাতে গিরি পাদস্থিত অনেক গ্রামাদি সহসা জলপ্লাবিত ও বিনষ্ট হইয়া যায়। এমন কি উক্ত পর্ব্বত হইতে ৪০ বা ৫০ ক্রোশ দূরস্থিত স্থানও জলমগ্ন হইয়া থাকে। অপর আগ্নেয় গিরির মধ্যে ইটালির বিসুবিয়স্, শিশিলির এট্‌না এবং আইস্‌লণ্ডের হেক্লা সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত। বিসুবিয়স্ অনেক দিন অগ্নি উদ্গীরণ করে নাই, ইহাতে লোকে মনে করিয়াছিল যে উহা নির্ব্বাণ হইয়া গিয়াছে। এই বিশ্বাসে লোকে উক্ত পর্ব্বত সন্নিধানে গ্রাম ও নগরাদি সংস্থাপন করিয়াছিল। ৭৯ খৃষ্টাব্দে সহসা উহার ভয়ানক অগ্ন্যুৎপাত আরম্ভ হয়, এবং উহা হইতে যে সমস্ত ভস্মাদি নিঃসৃত হয় তদ্দ্বারা হার্কুলিয়ম্ ও পম্পি নামক দুই সমৃদ্ধ নগর একেবারে প্রোথিত হইয়া যায়। তৎপরে ১৬৩১ খৃষ্টাব্দে পুনর্ব্বার উক্ত আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাত আরম্ভ হয়, এবং তাহাতে রেসিনা প্রভৃতি নগর ও অনেক গ্রাম বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। তৎপরে উহার আর অগ্ন্যুৎপাত দেখা যায় নাই, কেবল ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে উহা হইতে কিঞ্চিৎ ধূমাদি নির্গত হইয়াছিল; সেই সময় প্রবল ভূমিকম্প হয়।

এট্‌না নামক আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাত আরও ভয়ঙ্কর; ইহার অগ্নিস্রোত ৩০ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া থাকে। ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে উহার যে অগ্ন্যুৎপাত হয়, তাহাতে অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছিল। হেক্লা নামক আগ্নেয় পর্ব্বত হইতে যে অগ্নি উদ্গীর্ণ হয়, তাহাতে চতুর্দ্দিকে একশত মাইল পর্য্যন্ত সমুদয় স্থান ভস্মরাশি সমাবৃত হইয়া থাকে। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে তাহার শেষ অগ্ন্যুৎপাত হয়; ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে উহার অগ্ন্যুৎপাতের সূত্রপাত হয় কিন্তু তাহা বৃদ্ধি পায় নাই।

ভূমিকম্প।

আমাদের দেশে সকলেই ভূমিকম্পের বিষয় অবগত আছেন, কিন্তু তাঁহারা ইহা যে এক অতি ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক ঘটনা তাহা মনে করেন না। ইহার কারণ এই এতদ্দেশে ভূমিকম্পের বেগ অল্পই অনুভূত হইয়া থাকে। কিন্তু যে সকল প্রদেশে আগ্নেয় পর্ব্বত বিদ্যমান্ আছে অথবা যে স্থলে পূর্ব্বকালে আগ্নেয়গিরি ছিল এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়, সেই সকল স্থলে ভূমিকম্প প্রবলাকার ধারণ করে। এক একবার তথায় এরূপ ভূমিকম্প হয় যে বহু নগর ও গ্রাম অধিবাসিগণসমেত একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়। পৃথিবীর স্থান-বিশেষে ভূমিকম্প এক প্রকার প্রায়িক ঘটনার মধ্যে গণিত হয়; আমাদের দেশে যেমন বৃষ্টি-পতন প্রায়িক ঘটনা, জাপানদ্বীপ ও দক্ষিণ আমেরিকায় ভূমিকম্পও তদ্রূপ। আমরা এতদ্দেশে যদিও ভূমিকম্প প্রায় অনুভব করি না, তথাপি এখানে অতি স্বল্প পরিমাণ ভূমিকম্প প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। ভূমিকম্প পরিমাণ করিবার জন্য একপ্রকার যন্ত্র আছে, তদ্দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে আমরা অনুভব করিতে না পারিলেও ভূমিকম্প ঘটিয়া থাকে। হম্বল্ট্ কহেন যে পৃথিবীর কোন না কোন স্থানে প্রতিমুহূর্ত্তেই ভূমিকম্প হইতেছে এবং সর্ব্বদাই পৃথিবীর ভূরিভাগ কম্পিত হইতেছে ও স্বল্পভাগ স্থির থাকিতেছে।

ভূমিকম্প অনুধাবন করিলে বোধগম্য হয় যে কোন আবদ্ধ বেগ পৃথিবীর অভ্যন্তরে বর্ত্তমান আছে। যে কারণেই হউক্, পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগে অবশ্যই কোন বেগ সমুৎপন্ন হয়; সেই বেগবশতই ভূমিকম্প হইয়া থাকে। বৈজ্ঞানিকগণ এই বেগকে দুই জাতীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। একপ্রকার বেগ ভূমির বহু নিম্ন হইতে উপরদিকে সঞ্চালিত হয়, ইহাকে ঊর্দ্ধগ বেগ কহা যায়, অপর এক

প্রকার বেগ ভূমির নিম্নে জলস্রোতের ন্যায় গমন করে, ইহাকে সামতলিক বেগ কহা যায়। উর্দ্ধগ বেগ অধিক প্রবল না হইলে ইহাতে গৃহমধ্যস্থিত ঘটি বাটী প্রভৃতি পরস্পর আহত হইয়া ঠুন্ ঠুন্ শব্দ করিতে থাকে। অপেক্ষাকৃত প্রবল বেগ উপস্থিত হইলে লম্বমান ঘণ্টা সকল আপনি বাজিয়া উঠে, গৃহের কড়িকাষ্ঠ প্রভৃতি ফাটিতে থাকে এবং উচ্চ মঞ্চ সমস্ত ভগ্ন হয়, বেগ আরও বৃদ্ধি পাইলে প্রাচীর সমূহ বিদীর্ণ হয় এবং সুদৃঢ় অট্টালিকা সমূহও ভূমিসাৎ হইয়া ভগ্ন-স্তূপ-রূপে বিরাজ করিতে থাকে।

ক্যালেব্রিয়া ও শিশিলিতে ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে যে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হয়, তাহাতে এক লক্ষ লোকেরও অধিক বিনষ্ট হইয়াছিল। ইহাতে সাইলা নামক স্থানের উন্নত পর্ব্বত ভগ্ন হইয়া সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়াছিল। শতাধিক ক্ষুদ্র শৈল বিপর্য্যস্ত হইয়াছিল এবং প্রায় ৪০০ গ্রাম ও নগর একেবারে ভূগর্ভে মগ্ন হইয়া গিয়াছিল। একজন লোক ও তাহার স্ত্রী অশ্বারোহণ করিয়া যাইতেছিল, সহসা তাহারা উৎক্ষিপ্ত হইয়া এক নদীর অপর পারে গিয়া পতিত হইয়াছিল। একটা উন্নত বৃক্ষের উপর একব্যক্তি আরোহণ করিয়াছিল, এমন সময় ভূমিকম্প উপস্থিত হওয়ায় বৃক্ষটা নিম্নস্থ বহুল পরিমাণ মৃত্তিকাস্তূপ ও শিখরস্থ মনুষ্যসমেত বহুদূরে গিয়া পতিত হইয়াছিল। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে কাটানিয়া নামক স্থানে যে ভূমিকম্প হয়, তাহাতে প্রাচীর সমূহ প্রতিক্ষণে বিদীর্ণ হইয়া পুনর্ব্বার সংযুক্ত হইতেছিল। প্রস্তরাদি নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি সমূহ যে মুখে দণ্ডায়মান ছিল তাহার বিপরীতদিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ব্যাল্‌পারেসো নামক স্থানে ১৮২২ খৃষ্টাব্দে ১৯শে নবেম্বর যে প্রবল ভূমিকম্প হয়, তাহাতে বাটীসমূহ এক মুখ হইতে অন্য মুখে ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং তালবৃক্ষসমূহ দড়ির মত পাকাইয়া গিয়াছিল।

রাইওবাম্বা নগরে ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি যে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হয়, তাহাতে অনেক বড় বড় অট্টালিকাসমূহ ভগ্ন না হইয়া যে মুখে ছিল তাহার বিপরীত দিকে ফিরিয়া আসিয়াছিল; এবং সরলরেখাক্রমে যে সকল বৃক্ষের শ্রেণী উদ্যান মধ্যে শোভা পাইত, তাহারা বক্ররেখা-ক্রমে শ্রেণীবদ্ধ হইয়াছিল। যে সকল ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন শস্য উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহারা সমস্ত মিশ্রিত হওয়াতে সকল ক্ষেত্রে সকল প্রকার শস্যই দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। এক বাটীর দ্রব্যজাত অপর বাটীর ভগ্নাবশেষ মধ্যে প্রোথিত হইয়াছিল। এই ভূমিকম্পে কঠিন ভূভাগ জলস্রোতের ন্যায় সঞ্চালিত হইয়া ইতস্ততঃ গমন করিয়াছিল, ইহাতে একজনের ভূমির কিয়দংশ বৃক্ষাদি সমেত অপরের উদ্যানে এবং একজনের গৃহ অপরের ভূমি মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। এই ভূমিকম্পের পর স্ব স্ব দ্রব্যের স্বত্ব নির্ণয় করিতে অনেক মোকদ্দমা মামলা হইয়াগিয়াছে।

ভূমিকম্পের সময় কখন কখন ভূমির উপর বৃহৎ গহ্বর সমুৎপন্ন হইতে দেখা যায়। এই সকল গহ্বর অতলস্পর্শ ও ভয়ঙ্কর অন্ধকারাবৃত হইয়া ক্রমশ জলে পরিপূর্ণ হয়। সিন্ধুনদার ডেল্টা বা মুখপ্রদেশে ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে এক ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হয়, তাহাতে ১৫০০ বর্গমাইল পরিমিত স্থান একেবারে ভূগর্ভে নিমগ্ন হইয়া যায়, এবং সমুদ্রজল আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করে। উহার মধ্যস্থলে সিন্দ্রিনামক এক দুর্গ ছিল, তাহাতে ইংরাজের অনেক সৈন্য ছিল; ভগবানের কৃপায় দুর্গটী রক্ষা পাইয়াছিল; পরদিন দুর্গস্থ লোকসমূহ নৌকাযোগে পলায়ন করিয়া রক্ষা পায়। ঐ সময়েই এক স্থানে আট মাইল পরিমিত সমতল ভূমি প্রায় দশ ফুট উন্নত হয়; ঐ উন্নত ভূমিকে একণে "আল্লা বাঁধ" কহিয়া থাকে। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে চট্টগ্রাম প্রদেশে যে প্রবল ভূমিকম্প হয়, তাহাতে উন্নত পর্ব্বতসমূহ একেবারে ভূগর্ভে

প্রবিষ্ট হইয়া যায়, এবং তাহাদের উপরিভাগ জলে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। ইহাতে অতীত পর্ব্বতের কিছুমাত্র চিহ্ন বর্ত্তমান নাই।

ভূমিকম্পের বেগ প্রতিমিনিটে ছয় হইতে ১৬ মাইল পর্যান্ত গমন করে। যখন কোন স্থানে ভূমিকম্প হয়, তখন তাহার বেগ যে যে স্থানে অনুভূত হয়, তাহার মানচিত্র করিলে দেখা যায় যে ভূমিকম্প ডিম্বাকৃতি স্থান অধিকার করিয়া আবিভূ ত হয়। কদাচিৎ ভূমিকম্প স্থানবিশেষে পৃথিবী পরিবেষ্টন করে। লিসবন নগরের প্রসিদ্ধ ভূমিকম্পের বেগ গ্রীণ্‌লণ্ড, ক্যানেডা, আণ্টিলিস্, উত্তর আফ্রিকা, স্পেন, ফ্রান্স, সুইজর্লণ্ড, জর্ম্মাণি, সুইডেন্, নরওয়ে এবং আইস্‌লণ্ডে অল্পবিস্তর অনুভূত হইয়াছিল। ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে এই ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হয়, তাহাতে একমাত্র লিস্‌বন নগরের ৬০০০০ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ভূমিকম্প হইবার সময় ভূগর্ভে বজ্রধ্বনির ন্যায় শব্দ অনুভূত হয়; সময় সময়ে এই ধ্বনি এত প্রবল হয় যে তাহাতে অট্টালিকাদি ভগ্ন হইবার শব্দ একেবারেই অনুভূত হয় না। ভূমিকম্পের সময় অপর এক কারণেও প্রবল অনিষ্ট সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। সেই সময় সমুদ্র কূলভাগ হইতে বহুদূর সরিয়া যাইতে থাকে এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে সেইজল অগ্রসর হইয়া বেলাভূমি অতিক্রম করত ৩০।৪০ ফুট উন্নত হইয়া দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, এবং যাহা পায় তাহাই ধৌতকরতঃ সমুদ্রগর্ভে তাহার ভূরিভাগ বহন করিয়া লইয়া যায়। লিস্‌বন নগরের ভূমিকম্পে এইরূপে বহু দ্রব্যাদি সমুদ্রগর্ভে নীত হইয়াছিল।

এই সমস্ত ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প দ্বারা ভূপৃষ্ঠের নানা পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। নদী সমূহের গতি ফিরিয়া যায় ও পর্ব্বতসমূহ অদৃশ্য হয়। নূতন হ্রদ নির্ম্মিত হয়, পুরাতন জলাশয় বুজিয়া যায়। ভূমিকম্পের প্রকৃত কারণ ভালরূপ নির্ণীত হয় নাই; তবে ইহা নিশ্চয় যে, যে

কারণে আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাত হয়, সেই কারণেই ভূমিকম্প হইয়া থাকে। অভ্যন্তরীণ তরলাগ্নির প্রবলান্দোলনেই ভূমি কম্পিতা হন তাহার সন্দেহ নাই।

অকৃত্রিম পর্ব্বত-সেতু।

পৃথিবীর নানাস্থানে নানাবিধ আশ্চর্য্য বস্তু আছে বটে, এবং ঐ

সকল বস্তুর বিষয় চিন্তা করিলে বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইতে হয়, ইহাও সত্য বটে; কিন্তু ভার্জিনিয়া প্রদেশের অকৃত্রিম পর্ব্বত-সেতুর

বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে যাদৃশ চমৎকার ভাব আসিয়া উপস্থিত হয় তেমন আর কিছুতেই হয় না। উক্ত প্রদেশে এক পর্ব্বতের চূড়া হইতে অপর পর্ব্বতের চূড়া পর্য্যন্ত এমন এক সুবৃহৎ প্রস্তরময় অকৃত্রিম সেতু আছে যে তাহা পরমেশ্বর যেন তত্রত্য জনগণের প্রয়োজন বুঝিয়া একদিনে নিজহস্তে নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। মনুষ্য-কৃত সেতু যেমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও প্রয়োজনানুরূপ হইয়া থাকে, ইহাও ঠিক সেই প্রকার; কিন্তু ঈশ্বর ব্যতীত উক্ত পর্ব্বত সেতু মনুষ্য কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হওয়া নিতান্তই অসম্ভব। একটীমাত্র খিলানে সেতুটী নির্ম্মিত হইয়াছে; এই খিলানের বিস্তৃতি ৪৫ হইতে ৬০ ফুট; এই সেতুর উচ্চতা অর্থাৎ সমতল ভূমি হইতে সেতুর তলভাগ পর্য্যন্ত দুইশত ফুট, সেতুর উপরিভাগ পর্য্যন্ত মাপিলে ২৪০ ফুট হইয়া থাকে। উক্ত খিলানের আকৃতি অর্দ্ধ-ডিম্ব-সদৃশ।

জল ও বায়ুর প্রভাবে বড় বড় পর্ব্বতেরও অংশবিশেষ শ্লথ হইয়া থাকে; বহুকাল জল প্রবেশ করায় ও ঝটিকা সহ্য করায় ঐ সকল অংশ স্থানচ্যুত হইয়া ভূতলে পতিত হয়। এরূপ ঘটনা অনেক ঘটিয়া গিয়াছে যে নানা বৃহৎ বৃক্ষাদি পরিশোভিত পর্ব্বতের কিয়দংশ স্থানভ্রষ্ট হইয়া সহসা ভূতলে পতিত হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা নিমেষ মধ্যে পর্ব্বত-তলের সমৃদ্ধ নগর একেবারে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত পর্ব্বত-সেতুর নিম্নভাগ এককালে বরাবর পর্ব্বতময় ছিল, পরে ক্রমে শ্লথ হইয়া ভূমিসাৎ হইয়াছে; কেবল উক্ত সেতুবৎ অংশটা পতিত না হইয়া রহিয়া গিয়াছে। ঐ প্রদেশে উক্ত সেতু না থাকিলে লোক সমূহের বড়ই ক্লেশ হইত; কিন্তু পরমেশ্বরের কি অপার করুণা! তিনি পর্ব্বতের সমস্ত ভগ্ন করিয়া কেবল সেতুবৎ অংশটী ভাঙ্গিলেন না।

এই সেতু সম্বন্ধে তিনটী দ্রষ্টব্য বিষয় আছে। তুমি উক্ত সেতুতে আরোহণ করিবার ইচ্ছা করিয়া ক্রমে উহার সর্ব্বোন্নত ভাগে উপস্থিত

হও ; দেখিবে যে পর্ব্বত পার্শ্বে যে পথ আছে তাহার সহিত ঐ সেতু এরূপ সুন্দর ভাবে সংযুক্ত এবং সেতুর দুই পার্শ্বে হ্রস্ব বৃক্ষগুল্মাদিদ্বারা এরূপ আচ্ছাদিত যে তুমি সেতুর মধ্যভাগে আসিলাম কিনা প্রথমেই বুঝিতে পারিবে না। কিন্তু যখন পার্শ্বস্থ বনমধ্য দিয়া চাহিয়া দেখিবে, তখন কতদূর উচ্চস্থানে আসিয়াছি বলিয়া মনে ভয়ের সঞ্চার হইবে। এই সেতুর দুই পার্শ্বে অকৃত্রিম আলিসাও আছে কিন্তু কেহই ভয়ে উহার উপর দিয়া নীচে চাহিয়া দেখিতে পারে না, কারণ অত উন্নত স্থান হইতে নীচে চাহিয়া দেখিলে মস্তক ঘূর্ণিত হয়।

তৎপরে তুমি নামিয়া সেতুর শেষভাগ হইতে পঞ্চাশ ফুট নিম্নে পর্ব্বতের অঙ্কে দণ্ডায়মান হইয়া সেতুর নিম্নদেশে অবলোকন কর। প্রথমে সেতুর নীচের পৃষ্ঠ দেখ ; কেমন সুন্দর স্থাপত্য কৌশল, যেন সুনিপুণ মিস্ত্রী দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে ; কিন্তু এপর্য্যন্ত কোন মিস্ত্রীই তদ্রূপ সেতুগ্রন্থনে সমর্থ নহে। তৎপরে পর্ব্বতপাদদেশে দৃষ্টিনিক্ষেপ কর ; তথায় সিডার্ নদী যেন একখানি সাদা চাদরের মত নিশ্চল ভাবে অবস্থিত করিতেছে ; সুদৃশ্য দেবদারু বৃক্ষসমূহ নিম্ন হইতে উপর পর্য্যন্ত থাকে থাকে যেন সাজান রহিয়াছে। এমন সুদৃশ্য স্থান অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।

যতক্ষণ না তলদেশে অবতীর্ণ হইবে ততক্ষণ এই সেতুর প্রকৃত অদ্ভুতত্ব সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না। এই অভিপ্রায়ে কিয়দ্দূর নিম্নে অবতরণ কর ; একেবারে তলদেশে হঠাৎ যাইতে পারিবে না, কারণ স্থানে স্থানে প্রস্তরময় প্রাচীর লম্বভাবে অবস্থিত ; সুতরাং অবতরণের পক্ষে অসুবিধা। গ্রীষ্মকালীন রৌদ্রতাপে এই স্থানে ভ্রমণ করা অতীব আনন্দজনক। একশত ফুট নামিয়া আসিলে দেখা যায় যে নির্ঝরবারি ধীরে ধীরে পদতল ধৌত করিয়া গমন করিতেছে ; নিম্ন-ভাগে সুন্দর জলপ্রবাহ সুমিষ্ট কল কল ধ্বনি করতঃ যে দিক্ দিয়া

সুবিধা পাইতেছে সেই দিক্ দিয়া গমন করিতেছে। উপর দিকে চাহিয়া দেখ, দেখিবে সেই বৃহদাকার সেতুর দুইপার্শ্বে বৃক্ষলতাদি শ্রেণীবদ্ধ হওয়ায় যেন এক ছড়া গাছের মালা প্রকৃতিদেবীর গলদেশে শোভা পাইতেছে। অধিক আর কি বলিব, সে স্থানে যেন প্রকৃতিদেবী মূর্ত্তিমতী হইয়া বিরাজমানা আছেন। স্বচক্ষে না দেখিলে কেবল বর্ণনা পাঠে সে স্থানের প্রকৃত শোভা হৃদয়ঙ্গম করা দুঃসাধ্য।

উষ্ণপ্রস্রবণ।

যে সকল প্রদেশে আগ্নেয় গিরি অবস্থিতি করে সেই সকল স্থানে মৃত্তিকা ভেদ করিয়া অত্যুষ্ণ জলরাশি সময়ে সময়ে শূন্যভাগে উৎপতিত হয়। এই অদ্ভুত প্রাকৃতিক ঘটনাকে উষ্ণপ্রস্রবণ কহিয়া থাকে। আইস্লাণ্ড্, জাভা, নিউজিলণ্ড্, মিসৌরী এবং উত্তর আমেরিকার পার্ব্বত্য স্থান সমূহে বিস্তর উষ্ণপ্রস্রবণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সকল উষ্ণ-প্রস্রবণ যখন জলরাশি উর্দ্ধে নিক্ষেপ করিতে থাকে তখন বহুলপরিমাণ জলীয় বাষ্প আকাশমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া থাকে। এই সকল উষ্ণ-প্রস্রবণের মধ্যে আইস্লণ্ডস্থিত প্রস্রবণ সমূহ অত্যন্ত প্রসিদ্ধ; তন্মধ্যে "বৃহৎ প্রস্রবণ" নামক উষ্ণপ্রস্রবণ এক অতি অদ্ভুত ব্যাপার। উষ্ণপ্রস্রবণ দুই প্রকার আছে; এক প্রকার প্রস্রবণ সর্ব্বদাই যেন এক কূপমধ্যে স্ফুটিত হইতেছে; আমাদের দেশে সীতাকুণ্ড নামক প্রস্রবণ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। অপর এক প্রকার উষ্ণপ্রস্রবণ যখন স্বীয় কূপমধ্যে অবস্থিতি করে তখন তত উষ্ণ অনুভব হয় না; কিন্তু মধ্যে মধ্যে তাহা হইতে প্রবল অত্যুষ্ণ জলরাশি অত্যন্ত বেগে উর্দ্ধগামী হইয়া থাকে। এই শেষোক্ত প্রস্রবণই অতি অদ্ভুত পদার্থ। আবার কোন কোন প্রস্রবণের জল কখনই স্ফুটিত হয় না, তাহা এরূপ উষ্ণ যে তাহার জল লইয়া তৎক্ষণাৎ স্নান করা যাইতে পারে। অপর উষ্ণ কর্দ্দম ও উষ্ণ
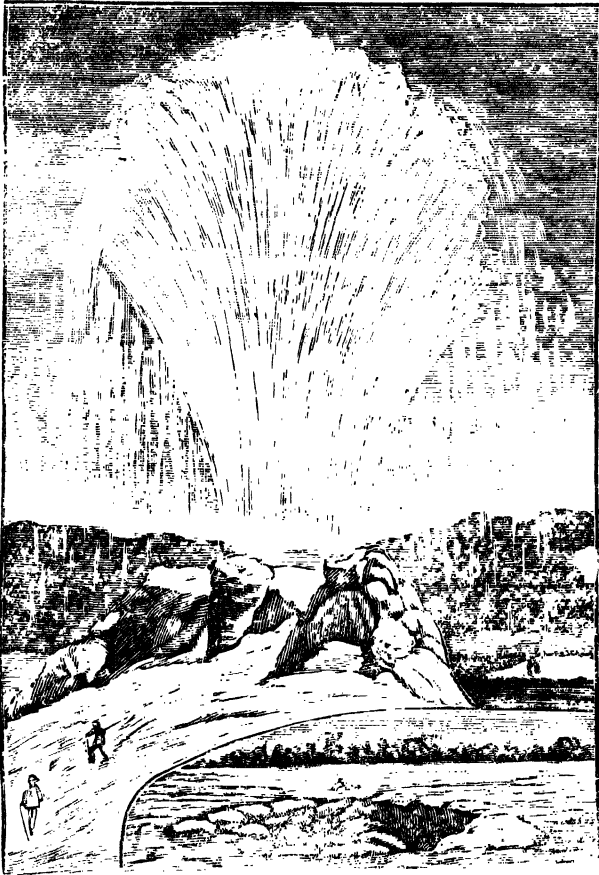
উষ্ণপ্রস্রবণ।

গন্ধকেরও প্রস্রবণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। বোধ হয় যেন বিস্তীর্ণ পুষ্করিণী-মধ্যে কর্দ্দম অথবা দ্রবীভূত গন্ধক ক্রমাগত ফুটিতেছে এবং প্রতিমুহূর্ত্তে অসংখ্য ধারা উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইতেছে।

পূর্ব্বোক্ত "বৃহৎ প্রস্রবণের" বহির্ভাগ এক উন্নত ভূমিখণ্ড ; উহার বেড় প্রায় ৪৬০ হস্ত এবং উচ্চতা ২২ হস্ত। এই উন্নত ভূমির শিখর-ভাগ ভিতরদিকে ক্রমনিম্ন এবং পরিমাণে ইহার বেড় ১১২ হস্ত। ইহার মধ্যস্থলে নিম্নদিকে এক নলবৎ গহ্বর অবস্থিতি করিতেছে ; এই নলের বেষ্টন প্রায় ২৭ হস্ত এবং ইহার গভীরতা সরল রেখা ক্রমে ৫২ হস্ত। এই নলবৎ গহ্বর মধ্য হইতে উষ্ণ জলের প্রস্রবণ নির্গত হয়। উক্ত গহ্বর মধ্যে যখন জল অবস্থিতি করে তখন তাহার উষ্ণতা ফার্হেনহাইটের তাপমান অনুসারে ১৭৬ ডিগ্রী। এক ঘণ্টা অথবা দেড় ঘণ্টা অন্তর অন্তর উষ্ণজলের প্রস্রবণ উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। জল উৎক্ষিপ্ত হইবার পূর্ব্বে ভূগর্ভে একপ্রকার প্রবল বজ্রধ্বনির ন্যায় শব্দ উৎপন্ন হয় ; পরক্ষণেই বিদ্যুৎবেগে জল উৎক্ষিপ্ত হইতে আরম্ভ হয়। প্রথমে জল এগার হস্ত হইতে আঠার হস্ত পর্য্যন্ত শূন্যে উৎপতিত হয়, তৎপরে ক্রমশঃ অধিকতর বেগে উর্দ্ধভাগে বিস্তীর্ণ হইতে থাকে। এইরূপে ২৪ বা ৩০ ঘণ্টা জল উঠিবার পরে এক অভূতপূর্ব্ব ঘটনা নয়নপথে পতিত হয়। প্রথমে অতি ভয়ঙ্কর শব্দ ভূগর্ভ হইতে সমুত্থিত হয় ; তৎপরেই বাষ্পরাশি পরিবেষ্টিত জলধারা অতি প্রবলবেগে সহসা সমুত্থিত হইয়া তুবড়ি যেমন উর্দ্ধগামী হয় সেই প্রকার শূন্যে উর্দ্ধক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। এই সময় উক্ত জলধারার পার্শ্বভাগ হইতে ক্ষুদ্রতর জলধারা অর্দ্ধ গোলাকার ভাবে ঘুরিয়া ভূতলে পতিত হইতে থাকে।

এই অত্যাশ্চর্য্য দৃশ্য কখন বাষ্পমণ্ডলে আচ্ছাদিত হওয়ায় অদৃশ্য হয়, কখনও বা নয়নগোচর হইতে থাকে। এই ব্যাপার কখনও দশ মিনিটের অধিককাল স্থায়ী হয় না। তৎপরে সহসা ঐ সমস্ত অদ্ভুত ব্যাপার অদৃশ্য হইয়া যায় এবং জল পূর্ব্বোক্ত নলবৎ গহ্বরের অনেক নীচে গিয়া পড়ে ; তখন, মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যে আশ্চর্য্য কাণ্ড ঘটিয়া গেল, তাহার কিছুই চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। এই প্রস্রবণের জলোৎ-

ক্ষেপ সম্বন্ধে সময়ের কোন স্থিরতা নাই ; কখন কখন বিনা জলোৎ-ক্ষেপে দুই তিন দিনও কাটিয়া যায়।

এই বৃহৎ উষ্ণপ্রস্রবণের নিকটে আর একটী উষ্ণপ্রস্রবণ আছে; ইহা হইতে যখন জলোৎক্ষেপ হয় তখন বৃহৎপ্রস্রবণ হইতে জলোৎক্ষেপ হয় না, আবার বৃহৎ প্রস্রবণ হইতে জল উদ্গীর্ণ হইবার সময় ইহার জল উৎপতিত হয় না। এই শেষোক্ত প্রস্রবণ ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে এক মহান্ ভূমিকম্পের সময় স্বয়ং সমুৎপন্ন হইয়াছিল। বৃহৎ প্রস্রবণ হইতে ৩৬ ক্রোশ দূরে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উষ্ণপ্রস্রবণের মধ্যে "ক্ষুদ্র প্রস্রবণ" নামে একটী বিখ্যাত উষ্ণপ্রস্রবণ আছে। ইহা হইতে জল প্রায় ৩০ হস্ত উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া থাকে।

উষ্ণপ্রস্রবণের কারণ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ এই প্রকার কহেন ; বৃষ্টিজল যে ভূমধ্যে শোষিত হয় তাহা ক্রমে ক্রমে বহুদূর নিম্নে গমন করে। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ অত্যুষ্ণ তরল অগ্নিবৎ পদার্থে পরিপূর্ণ ; জল যখন অতি নিম্নে গমন করে তখন তাপপ্রভাবে বাষ্প হইয়া বিস্তৃত হয় এবং অতিবেগে সঞ্চালিত হইয়া যেখানে কিছু সুবিধা পায় সেই স্থান ভেদ করিয়া উর্দ্ধগামী হইয়া থাকে। এই বাষ্প বিস্তৃত হইয়া উর্দ্ধগামী হইবার সময় জলভাগ যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাকেও ঠেলিয়া তুলে। ইহাতেই উষ্ণপ্রস্রবণের প্রথম উৎপত্তি হয় ; যখন একবার বাষ্প ও জল বহির্গত হইবার পথ প্রাপ্ত হইল তখন যত জল ঐ প্রকারে ভূগর্ভে প্রবিষ্ট ও অত্যুষ্ণ হইতে থাকে, ততই ঐ স্থান দিয়া নির্গত হয়। এইরূপে উষ্ণপ্রস্রবণ চিরকালই ক্রিয়াবান্ থাকে। যে সকল উষ্ণজল ভূগর্ভ হইতে সমুত্থিত হয় তাহা অত্যন্ত নির্ম্মল ; এমন কোন কৃত্রিম উপায় এপর্য্যন্ত নিরূপিত হয় নাই, যদ্দ্বারা জল সম্পূর্ণ নির্ম্মল করা যায়। লণ্ডন, কলিকাতা প্রভৃতি নগরে যে সমস্ত কলের জল নির্ম্মল বলিয়া

ব্যবহৃত হয়, বাস্তবিক তাহাতে নির্ম্মলতা সম্পূর্ণ অবস্থিতি করে না; কিন্তু সীতাকুণ্ড বা উষ্ণপ্রস্রবণের জল সম্পূর্ণ নির্ম্মল। কোন কোন উষ্ণপ্রস্রবণের জল যখন গহ্বর মধ্যে অবস্থিতি করে তখনও এতদূর উষ্ণ যে তাহাতে মাংস পাক করা যায়। তদ্দেশীয় লোকেরা কোন স্থালীমধ্যে জল ও মাংস রাখিয়া উক্ত গহ্বরস্থ জলে সংস্থাপন করে, ইহাতেই মাংস বিলক্ষণ সুসিদ্ধ হয়। জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে যে পর্ব্বত-গাত্রে ও সমুদ্রগর্ভেও উষ্ণপ্রস্রবণ অবস্থিতি করে।

জলপ্রপাত।

নদীসমূহ যখন পর্ব্বত হইতে সমুৎপন্ন হইয়া নিম্নাভিমুখে আগমন করে তখন উহাদের আকৃতি ক্ষীণ থাকে; ক্রমে নানা স্থানস্থ নির্ঝর-সমূহ আসিয়া একত্র মিলিত হয়, ইহাতে ক্রমশঃ পুষ্টকলেবর হইয়া থাকে। নদী প্রবলাকার ধারণ করতঃ নিম্নাভিমুখে গমন করিবার সময় যদি সম্মুখস্থ শৈলসমূহ দ্বারা এরূপ বাধা পায় যে জলরাশি গমন করিবার পথ না পায় তাহা হইলে জল সেই স্থানে ক্রমশঃ সঞ্চিত হইয়া শৈলশিখর পর্য্যন্ত সমুত্থিত হইতে থাকে। জল আরও সঞ্চিত হইলে থাকিবার স্থান না পাওয়ায় শৈলশিখর অতিক্রম করতঃ পরপার্শ্বে পতিত হইতে থাকে। যখন অত্যুচ্চ স্থান হইতে জলরাশি একেবারে নিম্নভাগে আসিয়া পড়ে তখন এক অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার সংঘটিত হয়! প্রবলবেগে জল পতিত হইবার সময় ভয়ঙ্কর শব্দ ও সূক্ষ্ম জলকণা সমুৎপন্ন হওয়াতে যে কি এক অনির্ব্বচনীয় দৃশ্য সমুপস্থিত হয় তাহা দর্শন না করিলে কেবল বর্ণনা মাত্র পাঠ করিয়া সম্যক্ উপলব্ধি করা যায় না। এই প্রকার দৃশ্যকে জলপ্রপাত কহিয়া থাকে। পৃথিবীর নানা স্থানে জলপ্রপাত দৃষ্ট হয়, কিন্তু আমেরিকার নায়াগারা নামক নদীর জল-প্রপাত এবং আফ্রিকার ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত।

আফ্রিকার জেম্বেসি নামক স্থানে ভিক্টোরিয়া নদীর যে জলপ্রপাত আছে, তাহা প্রসিদ্ধ ইংরাজ পর্য্যটক লিভিংষ্টোন কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হয়। দৃশ্যতা সম্বন্ধে এই জলপ্রপাত নায়েগারার জলপ্রপাত হইতেও উৎকৃষ্ট। জল প্রায় দুই সহস্র হস্ত প্রশস্ত হইয়া প্রায় তিন শত ফুট নিম্নে এক পাষাণময় স্থানে নিপতিত হইতেছে। জল পতিত হইবার সময় সহসা বায়ুর উপর ভর পতিত হওয়ায় বায়ু সঙ্কুচিত হইয়া অধোগামী হয় এবং সূক্ষ্ম জলকণা সমূহ বহন করতঃ পার্শ্বভাগ দিয়া
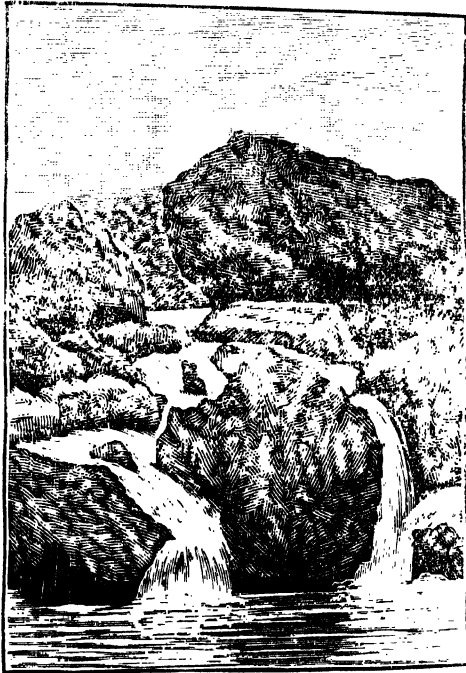
স্বীয় কলেবর নির্মুক্ত করতঃ পুনর্বার উর্দ্ধগামী হয়। ইহাতে সেই স্থান যেন সতত মেঘাবৃত বা কুজ্ঝটিকাময় বলিয়া বোধ হয়। যদি কোন

দর্শক পর্ব্বতের উপরিভাগ হইতে জলপ্রপাত অবলোকন করেন তাহা হইলে বহুল জলরাশি কিরূপ উন্মত্তভাবে নিপতিত ও সঞ্চালিত হইতেছে তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন। ইহার এরূপ বধিরকারী শব্দ যে নিকটে কেহ কাহারও কথা শুনিতে পায় না।

পৃথিবীতে যত জলপ্রপাত আছে তাহা আবার নায়েগারার জলপ্রপাতের নিকট অতি সামান্য অনুভূত হয়। এই নায়েগারা জল-প্রপাতের অত্যাশ্চর্য্য ভয়ঙ্কর দৃশ্য দর্শন করিবার জন্য পৃথিবীর নানাস্থান হইতে দর্শকগণ দলে দলে গমন করিয়া থাকে। নায়েগারা নদী ইরাই নামক এক হ্রদ হইতে সমুৎপন্ন হইয়া ক্রমশ ৩৪৬ ফুট নামিয়া আসিয়া অণ্টেরিও নামক হ্রদে নিপতিত হইতেছে। ইরাই হ্রদ হইতে জল-প্রপাত আরম্ভ হইবার স্থান পর্য্যন্ত নদী অত্যন্ত প্রশস্ত এবং ইহা প্রায় সমতল ভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত। এই স্থানে নদীমধ্যে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে; তন্মধ্যে একটী দ্বীপ এত বৃহৎ যে নদীকে দুই-ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। এই বিভক্ত জলপ্রবাহ যতক্ষণ না জলপ্রপাত পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে ততক্ষণ পুনর্মিলিত হয় নাই। ইহাই নায়েগারার প্রথমাংশ।

উক্ত নদীর দ্বিতীয় অংশ জলপ্রপাত হইতে আরম্ভ করিয়া লুইষ্টোন্ নামক স্থান পর্য্যন্ত শেষ হইয়াছে। সাত মাইল পথ বাকী থাকিতে নদী ক্রমশঃ প্রশস্ততায় ন্যূন হইয়া দুইশত বা আড়াই শত ফুট উন্নত পর্ব্বতে পরিবেষ্টিত এক স্থানে প্রবিষ্ট হইয়াছে। ভিক্টোরিয়া পয়েণ্ট নামক স্থান হইতে নায়েগারা জলপ্রপাত অতি সুন্দর দৃষ্টিগোচর হয়। এক্ষণে উক্ত জলপ্রপাত বিস্তারে ১৪০০ হস্ত এবং উচ্চতায় ১০৪ হস্ত। উক্ত পর্ব্বতবেষ্টিত স্থান পরিপূর্ণ করিয়া জলরাশি পর্ব্বতোপরিভাগ হইতে নিম্নাভিমুখে আগমন করিতে আরম্ভ করিবার সময়েই প্রকৃত দৃশ্য সমুপস্থিত হয়। প্রতিদিন নায়েগারার জলপ্রপাতে প্রায় এক শত

কোটী ঘনফুট পরিমিত জল পতিত হয়। এবং ইহার এত প্রচণ্ড শব্দ যে দশমাইল দূর হইতেও উহা শ্রুতিগোচর হয়। কোন কোন বিবরণমতে এরূপ অবগত হওয়া যায় যে একেবারে এক সহস্র কামান হইতে শব্দ নির্গত হইলে তাহা যেরূপ প্রচণ্ড অনুভূত হয় ও যেরূপ প্রবল ধূম নিঃসৃত হয় উক্ত জলপ্রপাতে প্রতি মুহূর্ত্তে তদ্রূপ শব্দ ও তাদৃশ বাষ্পরাশি সমুদ্ভূত হইতেছে। ঐ বাষ্পসমূহমধ্যে সূর্য্যকিরণ পতিত হইলে ইন্দ্রধনুর ন্যায় নানাবর্ণ সমুদ্ভূত হয়। ইহাতে সে স্থানের শোভা অতি মনোরম হয়। আমাদের দেশে কাবেরী প্রপাত, নর্ম্মদা প্রপাতও ঐরূপ অদ্ভুত ও বিস্ময়জনক। কেহ কেহ কহেন নায়েগারা জলপ্রপাতের শব্দ আটার ক্রোশ দূর হইতেও শ্রবণ করা যায়; এবং ইহা হইতে যে ফেনরাশি ঊর্দ্ধভাগে উৎক্ষিপ্ত হয় তাহা ৩১ ক্রোশ দূর হইতেও দৃষ্টিগোচর হয়। নায়েগারা নদী লুইষ্টোন্ নামক স্থানে উপস্থিত হইলে তাহার আর প্রবল বিক্রম কিছুই লক্ষিত হয় না; তৎপরে কএক মাইল পথ অতিক্রম করিয়া অণ্টেরিও হ্রদে মিলিত হইয়াছে। নায়েগারার তৃতীয় অংশে নৌকা করিয়া অনায়াসে গমন করা যায়।

পাতাল-পুরী।

আমরা গল্পে ও পুরাণাদিতে পাতাল-পুরীর কথা শ্রবণ করিয়া থাকি। কেহ কেহ বলেন ভূমির নিম্নে বাসোপযুক্ত স্থান থাকা অসম্ভব, অতএব পাতাল বলিলে পৃথিবীর অপর পৃষ্ঠই বুঝাইয়া থাকে; এই কারণে আমেরিকা আমাদের সম্বন্ধে পাতাল-পুরী বলিতে হইবে। কিন্তু বাস্তবিকই ভূমির নিম্নে অতি সুন্দর অবস্থানোপযোগী শূন্যময় স্থান পৃথিবীর নানা স্থানে অবস্থিত করে; তাহাদের বিবরণ পাঠ করিলে উহাদিগকেই পাতালপুরী বলা ন্যায়সঙ্গত বলিয়া বোধ হইবে। এস্থলে আমরা একটী প্রসিদ্ধ পাতালপুরীর বিষয় বর্ণনা করিতেছি।

ভূমধ্যসাগরে এণ্টিপেরাস্ নামক এক দ্বীপ আছে; তাহাতে যে পাতালপুরী অবস্থিত করিতেছে, তাহা শ্রবণ করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। উপরে উন্নত পার্ব্বত্য প্রদেশ এবং তাহার পাদদেশে উক্ত পাতালপুরীর দ্বার, এই দ্বার সন্নিধানে স্বাভাবিক স্তম্ভমধ্যে প্রস্তরোপরি খোদিত যে সকল নাম এখনও পাঠ করিতে পারা যায়, তদ্দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে এই পাতালপুরী বহুকাল পূর্ব্বে লোকে অবগত ছিল। কথিত আছে যে এণ্টিপেটার প্রসিদ্ধ আলেক্জাণ্ডারের সহিত বিপক্ষতা করিয়া যখন বিফলকাম হয় তখন সে দলবল সমেত এই পাতালপুরীর মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। এক ব্যক্তি এই পাতালপুরীর মধ্যে অবতরণ করিয়া তৎসম্বন্ধে যে যে বিবরণী প্রচার করিয়াছেন, আমরা তাহার সারাংশ সঙ্কলিত করিলাম।

"আমরা জাহাজ হইতে উক্ত দ্বীপে অবতরণ করিয়া দুই মাইল গমন করিবার পর পাতালপুরীর দ্বার দেখিতে পাইলাম। ইহা বিস্তীর্ণ অথচ অনুচ্চ এবং প্রবেশপথ অবশ্যই বন্ধুর ও ক্রমেই অন্ধকারময়। চল্লিশ হস্ত গমন করিয়াই আমরা সম্পূর্ণ অন্ধকারে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তখন মশাল জ্বালিয়া চলিতে লাগিলাম। প্রবেশের সময় তদ্দ্বীপবাসী কয়েকজন পথপ্রদর্শক সঙ্গে লইলাম। কিয়দ্দূর গমন করিবার পর আমরা কোটিদেশে রজ্জুবন্ধন করিলাম এবং এক গভীর স্থানের তটে নীত হইলাম। পথপ্রদর্শকগণ সেই রজ্জুদ্বারা আমাদিগকে নামাইয়া দিতে লাগিল। আমরা তলদেশে উপস্থিত হইয়া পরম বিস্মিত ও ভীত হইতে লাগিলাম এবং কহিলাম পাতালপুরী কোথায়? পথপ্রদর্শকগণ কহিল, সে এখনও অনেক দূরে আছে। তৎপরে তাহারা আমাদিগকে অপর এক গভীর স্থানের নিকট লইয়া গেল। এই গভীর স্থান পূর্ব্বস্থান অপেক্ষাও নিম্নতর ও ভয়ঙ্কর। মশালের আলোকে দেখা গেল এই নিম্নস্থান পূর্ব্ববৎ লম্বভাবে অবস্থিত না হইয়া গড়ানিয়া ভাবে

অবস্থিত ; কিন্তু মধ্যে মধ্যে প্রস্তর সমূহ অত্যন্ত বন্ধুর ভাবে গ্রথিত। ইহাতে অবতীর্ণ হইবার সময় দেখা গেল নিম্ন প্রদেশে ভয়ঙ্কর অন্ধকারময় গহ্বর মুখব্যাদান করিয়া অবস্থিতি করিতেছে। যদি দৈবাৎ কাহারও পদস্খলন হয়, তাহা হইলে সে একেবারে তন্মধ্যে নিমগ্ন হইয়া যাইবে। আমাদের পথপ্রদর্শকগণ অগ্রে অগ্রে গমন করিয়া অবশেষে অতি ভয়ঙ্কর গভীর স্থানে গিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা নিম্ন হইতে আমাদিগকে ডাকিতে লাগিল। আমরা ৩০ ফুট্‌ নামিয়াই দেখি একদিকে ভয়ঙ্কর অতল গহ্বর এবং অপরদিকে বহুল নিম্নে অতিবন্ধুর প্রস্তররাশি। এই সময় আমি নিতান্ত সাহসহীন হইয়া পড়িলাম এবং কহিলাম আমি আর অগ্রসর হইব না। কিন্তু পথপ্রদর্শকগণ কহিল যে বিপদের কোন সম্ভাবনা নাই। আমরা একখানি পুরাতন সিঁড়ি বা মই দেখিতে পাইলাম, এবং তৎসংযোগে অবতরণ করিলাম।

"এই স্থানে অবতরণ করিয়া আমরা এক পথ দেখিতে পাইলাম। ইহা ৯ ফুট উচ্চ ও ৭ ফুট বিস্তৃত। ইহার তলভাগ মসৃণ হরিৎবর্ণ মার্ব্বেল প্রস্তর আচ্ছাদিত। ইহার প্রাচীর ও ছাদ এরূপ পরিষ্কার যেন শিল্পকর্ম্মদ্বারা মনুষ্য কর্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে। যখন আমরা এই পথে প্রবেশ করিলাম তখন মনে করিলাম আমাদের পথপ্রদর্শকগণের মধ্যে যে দুইজন অগ্রে অবতীর্ণ হইয়াছিল, তাহাদের সহিত মিলিত হইব। কিন্তু যখন আমরা উক্ত পথের শেষভাগে উপনীত হইলাম, তখন অপর এক গভীর স্থান দেখিতে পাইলাম। তথায় অপর একখানি মই দিয়া নীচে অবতীর্ণ হইলাম। তৎপরে অপর এক পথে ২০ ফুট গমন করিয়া এক অতিশয় বন্ধুর পথে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। এই স্থানে যাইতে যাইতে কুণ্ডলীভূত সর্পসমূহ ঠিক জীবিত অবস্থার ন্যায় দৃষ্ট হইল, কিন্তু সে সমস্ত প্রস্তরবৎ কঠিন। যখন আমরা এইরূপে ২০০ গজ অগ্রসর হইলাম তখন দুইটী সুন্দর পীতবর্ণ মার্ব্বেল প্রস্তরের স্তম্ভ দেখিতে

পাইলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে আমরা অপর এক গভীর স্থানে অবতীর্ণ হইলাম এবং পথপ্রদর্শকগণ কহিল এইটাই শেষ। নিম্নে অবতরণ করিয়া সমতল স্থান পাইলাম; ৪০ গজ চলিয়া যাইবার পর এক গলি দেখিতে পাইলাম, ইহার পার্শ্বস্থ প্রাচীর ও ছাদ কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর দ্বারা গঠিত। মশালের আলোকে আমরা দেখিলাম মস্তকোপরিস্থ ছাদ বন্ধুর প্রস্তরময়; পাথরগুলা যেন মাথার উপর খসিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছে এবং স্থানে স্থানে মলিন জলের হ্রদ দেখিতে পাইলাম। এই সময় আমি গভীর চিন্তায় মগ্ন হইলাম এবং ভাবিতে লাগিলাম, কৌতুহল-প্রদীপ্ত হইয়া এখানে আসিয়া ভাল কাজ করি নাই; এস্থান হইতে পুনর্ব্বার সূর্য্যালোকিত স্থানে গমন করিব সে আশা নাই।

"এইরূপ চিন্তায় মগ্ন হইয়া কিয়ৎক্ষণ পরে দেখি যে আমাদের চারিজন পথপ্রদর্শক হারাইয়া গিয়াছে। আমরা ভাবিলাম যে তাহারা হয়তো উক্ত হ্রদ মধ্যে পতিত হইয়া বিনষ্ট হইয়াছে, কিন্তু অবশিষ্ট দুইজন পথ-প্রদর্শক কহিল যে আমরা শীঘ্রই উহাদের সহিত মিলিত হইব; আমাদের পর্য্যটন শেষ প্রায় হইয়াছে। এক্ষণে আমাদের পথ এরূপ সঙ্কীর্ণ হইতে লাগিল যে হামাগুড়ি দিয়া যাইতে হইল। এই সময় সহসা আমরা "হিস্ হিস্" শব্দ শুনিতে পাইলাম এবং দেখিলাম যে আমরা সম্পূর্ণ অন্ধকারে অবস্থিতি করিতেছি। পথপ্রদর্শকদ্বয় কহিল যে হঠাৎ তাহাদের মশাল হ্রদ-জল মধ্যে পতিত হইয়াছে। তাহারা আমাদিগকে গুড়ি মারিয়া যাইতে কহিল এবং কহিল যে বিপদের কোন আশঙ্কা নাই। এই লোকদিগের সাহস দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইলাম। আমি মনে করিলাম আর অগ্রসর হইয়া ফল কি, আমাদের আর উদ্ধারের উপায় নাই অতএব এই স্থানেই শয়ন করিয়া মৃত্যুর অপেক্ষা করি। একজন পথপ্রদর্শক আমার নিকট আসিয়া আমার চক্ষুদ্বয় বন্ধন করিল এবং আমায় টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। তখন আমি আরও ভীত

হইলাম এবং প্রতি মুহূর্ত্তেই মৃত্যুর সম্ভাবনা করিতে লাগিলাম। এমন সময় আমি সহসা এক প্রস্তরের উপর উত্থাপিত হইলাম এবং চলিবার উপযুক্ত স্থান প্রাপ্ত হইলাম। সেই সময় আমার চক্ষুর বন্ধন বিদুরিত হইল। তখন চক্ষু উন্মীলিত করিয়া যেরূপ আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখিলাম তাহা কথায় বর্ণনা যায় না। দেখিলাম এক অতি প্রশস্ত স্থানে উপনীত হইয়াছি; তাহা বহুল মশালসমূহের আলোকে আলোকিত হইতেছে এবং আমরা যতগুলি আসিয়াছিলাম সকলেই সেই স্থানে উপস্থিত। তখন জানিলাম যে পূর্ব্বোক্ত চারিজন পথপ্রদর্শক এখানে আসিয়া চারিদিকে মশাল জ্বালিবে বলিয়া অগ্রে চলিয়া আসিয়াছিল।

"এই স্থান এক অতি প্রশস্ত গৃহের ন্যায়; ইহার দৈর্ঘ্য ১২০ গজ, বিস্তার ১১৩ গজ এবং উচ্চতা ১৬ গজ। ইহার প্রাচীর সমস্তই শ্বেত-বর্ণ মসৃণ মার্বেল প্রস্তরে গঠিত। ছাদ খিলানযুক্ত, তাহা হইতে যষ্টির মত আকৃতি বিশিষ্ট শুভ্র মার্বেল প্রস্তরসমূহ লম্বমান রহিয়াছে। এই স্থানের আশ্চর্য্য দৃশ্য যে একবার দেখিবে সে জীবনে তাহার কিয়দংশও বিস্মৃত হইবে না। এই প্রশস্ত পাতালপুরী প্রকৃতি স্বহস্তে নির্ম্মাণ করিয়াছেন; একশত মশাল ও চারিশত প্রদীপ এই স্থানে জ্বালিলে তবে ইহার সর্ব্বত্র আলোকিত হয়; এই স্থান, প্রথম প্রবেশ দ্বার হইতে এক সহস্র ফুট নিম্নে অবস্থিত। আমরা এই স্থানে তিন ঘণ্টা অবস্থিতি করিয়াছিলাম। উক্ত স্থান হইতে আরও নিম্নে স্থান আছে কি না তাহা বলা যায় না। তদ্দ্বীপবাসিগণ কহে, উক্ত পাতালপুরীর সহিত সমুদ্রের সংযোগ আছে। তাহারা কহে একটা ছাগল দৈবাৎ পাতাল-পুরীতে প্রবেশ করে, তৎপরে ৪০ মাইল দূরস্থিত নিউ দ্বীপে তাহাকে দেখিতে পাওয়া যায়।"

বালুকাস্তম্ভ।

সমুদ্রে যেমন ঘূর্ণমান বায়ুর ক্রিয়ায় জলস্তম্ভ উৎপন্ন হয়, মরুভূমিতে সেইরূপ বালুকাস্তম্ভ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। আফ্রিকায় সাহারা নামে যে সুবিস্তীর্ণ মরুভূমি আছে, তাহা কেবল রাশীকৃত বালুকা দ্বারা পরিপূর্ণ। শত শত মাইল লইয়া ঐ মরুভূমি বিস্তৃত রহিয়াছে; সেস্থানে কস্মিন্‌কালেও বৃষ্টি হয় না, কেবল সুতীক্ষ্ণ রবিকিরণ তথায় চিরকাল রাজত্ব করিয়া থাকে। এই মরুভূমির উপর দিয়া নানা স্থানে যাইবার পথ আছে, সে পথে উষ্ট্র ভিন্ন আর কেহই চলিতে পারে না। সেই মরুভূমিতে ঘূর্ণমান বায়ুর সংযোগে আশ্চর্য্য বালুকাস্তম্ভ সমূহ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে, এবং তাহা হেলিতে দুলিতে বায়ুর গতি অনুসারে গমন করিতে থাকে। অনেকে কহেন, পথিকগণ এই সমস্ত বালুকারাশি দ্বারা প্রোথিত ও বিনষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু অপরে কহেন, মরুভূমিতে বালুকাস্তম্ভ তত বিপদজনক নহে। কিন্তু বালুকাস্তম্ভ যে এক বিচিত্র প্রাকৃতিক দৃশ্য তাহাতে সংশয় নাই। এই বালুকাস্তম্ভ বহুদূর উন্নত হইয়া থাকে; সময়ে সময়ে ২০০০ ফুট পর্য্যন্ত উন্নত হয়। এই সকল বালুকারাশি আকাশে উত্থিত হইয়া বহুদূর গমন পূর্ব্বক নগরবিশেষে বা গ্রামবিশেষে গিয়া ভূমিতলে অবতীর্ণ হয়। ইহাতে তথায় সহসা বালুকা বৃষ্টি দেখিয়া লোকে বিস্মিত হইয়া থাকে।

উত্তপ্ত বায়ু।

স্থান বিশেষে গ্রীষ্মকালে বায়ু এরূপ উত্তপ্ত হয় যে, তদ্দ্বারা জীবগণ প্রায় অর্দ্ধ-দগ্ধ হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের মধ্যভাগে "লু" নামক যে বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। ঐ বায়ু রাজপুতানার অন্তর্গত মরুভূমি হইতে উৎপন্ন হইয়া দেশময় হইয়া থাকে। আফ্রিকায় সাইমুম্‌ ও সিরোক্কো নামক যে বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহা অতিশয় ভয়ঙ্কর বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। যখন সাইমুম প্রবাহিত হইতে

বালুকাস্তম্ভ।

আরম্ভ হয়, তখন সাহারা মরুভূমিস্থ উষ্ট্রবাহী পথিকগণ মহা বিপদে পতিত হয়। শুনা গিয়াছে যে, উষ্ট্রগণ ঐ বায়ুর আগমন পূর্ব্বে বুঝিতে পারে, এবং সহসা ভূমির উপর পতিত হইয়া বালুকামধ্যে মুখ প্রবিষ্ট

করিয়া অবস্থিতি করে। বায়ু চলিয়া গেলে পুনর্ব্বার উত্থিত হয়। মনুষ্যগণও উষ্ট্রের ন্যায় অবস্থিতি করে; ইহাতে তাহারা উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধার পাইতে পারে। সর্ব্বাপেক্ষা সিরোক্কো নামক বায়ু নাকি অতীব ভয়ঙ্কর; ইহা নিশ্বাসসহ গ্রহণ করিলে মনুষ্যাদি জীবগণ তৎক্ষণাৎ মৃত ও পূতিগন্ধময় হয়। ইহা প্রবাহিত হইবার পূর্ব্বে গন্ধকের মত গন্ধ অনুভূত হয়, এবং যেদিক্ হইতে আইসে, সেদিক্ যেন রক্তিমাবর্ণ ধারণ করে। ইহাতে উষ্ট্র ও পথিকগণ সিরোক্কোর আগমন বুঝিতে পারিয়া ভূমিতলে পতিত ও নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া রাখে। অতি স্বল্পক্ষণের মধ্যেই ঐ বায়ু চলিয়া যায়, তখন উহারা পুনরায় উত্থিত হয়।

কিন্তু পদার্থবিদ্ পণ্ডিতগণ কহেন যে সাইমুম্ সম্বন্ধে উক্তরূপ বর্ণনা অতিরঞ্জিত মাত্র। সাইমুম্ মার্চ মাসের শেষ হইতে আরম্ভ করিয়া মে মাসের অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত অবস্থিতি করে। দিবসে উক্ত বায়ুর আক্রমণ অনুভব হয়, কিন্তু গমনাগমন বা কোন কার্য্য উহার জন্য বন্ধ থাকে না। অবশ্য বায়ু অতিশয় উত্তপ্ত হয়, তাপমান যন্ত্রের ১২২ ডিগ্রী পর্য্যন্ত বায়ু উত্তপ্ত হইতে দেখা গিয়াছে। আর, সিরোক্কো নামক যে বিষাক্ত বায়ুর উপন্যাস চিরকাল চলিয়া আসিতেছে, বাস্তবপক্ষে তাহার কোনরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইটালি ও সুইজার্লণ্ড দেশে সিরোক্কো নামে একপ্রকার উত্তপ্ত বায়ু প্রবাহিত হয় বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা এমন কিছু বিশেষ ক্ষতি হয় না। ঐ বায়ু সাহারা হইতে উৎপন্ন হয় না, উহা আমেরিকার মধ্যভাগ হইতে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। উহাতে তৃণাদি ঝল্‌সিয়া যায় ও বৃক্ষের পত্র সমূহ শুষ্ক হইয়া পতিত হয়, এইমাত্র। আফ্রিকা বা আরব্য দেশের কোন স্থানেই সিরোক্কো বায়ুর নাম শুনিতে পাওয়া যায় না।

খনিজ পদার্থ।

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ অনেক অনুসন্ধান করিয়া স্থির করিয়াছেন, যে আমাদের এই পৃথিবী প্রথমাবস্থায় তরল অগ্নিময় পদার্থ ছিল। সম্ভবতঃ ইহা সূর্য্যেরই এক অংশ ছিল; কালক্রমে সূর্য্য হইতে বিচ্যুত হইয়া বেগে দূরদেশে বিক্ষিপ্ত হওয়াতে সূর্য্যের আকর্ষণ-শক্তিকে কিয়ৎপরিমাণে অতিক্রম করিয়াছে। তজ্জন্য পৃথিবী সূর্য্যকে পরিভ্রমণ করিতেছে ও দিন দিন শীতল হইয়া আসিতেছে। এইরূপে পৃথিবী শীতল হওয়াতে কঠিন হইয়াছে ও ক্রমে তদুপরি জীবগণের সত্তা সংঘটিত হইয়াছে। যাহা হউক পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগের ভূরি অংশ এখনও পূর্ব্ববৎ তরল অবস্থাতেই আছে, কেবল উপরের একখানি আবরণমাত্র শীতল হইয়া কঠিন হইয়াছে। যে অংশ কঠিন হইয়াছে তাহাতে কি কি দ্রব্য আছে তাহা নির্ণিত হইয়াছে ও হইতেছে, কিন্তু তরল পদার্থ মধ্যে কি কি বস্তু আছে তাহা নিরূপণ করিবার যো নাই। কিন্তু অনুমাণ হয় ঐ তরল অংশও কঠিনীভূত অংশসদৃশ পদার্থে সংগঠিত। আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাতে যে সকল দ্রব্য নিঃসৃত হয়, তাহা আমাদের অপরিচিত নহে। পৃথিবীর কঠিনীভূত অংশ যে সমস্ত মূলপদার্থে সংগঠিত, বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ তাহা নির্ণয় করিয়াছেন। আমরা স্বর্ণরৌপ্যাদি যে ধাতু ব্যবহার করি, গন্ধক, সোডা প্রভৃতি বস্তু নানা কার্য্যে নিয়োজিত করি, সে সমস্তই এই পৃথিবীর এক এক অংশ মাত্র। এমন কি জল এবং বায়ুও এই পৃথিবীর এক এক অংশ বলিতে হইবে, কারণ যে সমস্ত তেজঃপদার্থ বা মূলবাষ্প জল ও বায়ুতে অবস্থিতি করিতেছে এই পৃথিবীর সত্তাতেই উহাদের সত্তা উপলব্ধি হইয়া থাকে। পৃথিবী হইতে অতি দূরে জলও নাই বায়ুও নাই।

হিন্দুশাস্ত্রে কহে ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ হইতে সমস্ত পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে। শাস্ত্রে আরও কহে আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজঃ, তেজঃ হইতে জল ও জল হইতে ক্ষিতির উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু অধুনাতন বিজ্ঞান-শাস্ত্রে কহে জগতে এপর্য্যন্ত ৬৯ বা ৭০টী মূলপদার্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে, ঐ সকল মূলপদার্থ নানারূপে মিশ্রিত হইয়া এই জগতের নানাবিধ অকৃত্রিম ও কৃত্রিম পদার্থ নির্ম্মিত হইয়াছে ও হইতেছে। ঐ সকল মূলপদার্থের মধ্যে কএকটী সচরাচর মূল অর্থাৎ অমিশ্র ভাবেই ব্যবহৃত হয়। ইহাদের মধ্যে কএকটার বিবরণ বর্ণিত হইল।

প্রথম স্বর্ণ। এই মূলপদার্থ পৃথিবীর নানাস্থানে খনির মধ্যস্থ বালুকান্তরে অতিসূক্ষ্ম কণিকারূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কৌশলপূর্ব্বক ধৌত করিয়া স্বর্ণ পৃথক্ করিতে হয়। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র ও সীসার সহিত মিশ্রিত ভাবে অবস্থিতি করিয়া থাকে। ভারতবর্ষ, চীন, অষ্ট্রেলিয়া ও আমেরিকা এবং ইয়ুরোপের নানা স্থানে স্বর্ণ সংগৃহীত হয়। স্বর্ণের মত ভারী ধাতু প্রায়ই নাই।

২য়, রৌপ্য। রৌপ্য এক মূলপদার্থ; ইহা ইয়ুরোপ, আমেরিকা ও পৃথিবীর নানা স্থানে প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাম্র প্রভৃতি ধাতুর সহিত মিশ্রিত ভাবে বৃহৎ বৃহৎ পিণ্ডরূপে সংগৃহীত হইয়া থাকে।

৩য়, তাম্র। পৃথিবীর নানা স্থানে, বিশেষতঃ সুপীরিয়র হ্রদের তীরবর্ত্তী স্থান সমূহে প্রচুরপরিমাণে তাম্র পাওয়া যায়। গন্ধক প্রভৃতির সহিত মিশ্রিত ভাবে সংগৃহীত হয়, পরে পৃথক্ করিয়া লওয়া হয়। স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র এক শ্রেণীর ধাতু। জলে ও বাতাসে ইহারা শীঘ্র বিনষ্ট হয় না। ইহাদের পরস্পরের সহিত পরস্পর মিশ্রিত হইলেও ভঙ্গপ্রবণ হয় না। এই উভয় কারণেই পৃথিবীর সর্ব্বত্র এই তিন ধাতুতেই মুদ্রা প্রস্তুত হইয়া থাকে।

৪র্থ, দস্তা। এই ধাতু স্বভাবতঃ রাসায়নিক সংযোগ দ্বারা অপর পদার্থে সংযুক্ত হইয়া থাকে ও রাসায়নিক প্রক্রিয়াদ্বারা উহাকে পৃথক্ করিতে হয়। দস্তা ও তাম্রের পরস্পর সংমিশ্রণে পিত্তল প্রস্তুত হয়।

৫ম, পারদ। এই ধাতু তরল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলাকার বীজস্বরূপ অবস্থায় খনি হইতে পাওয়া যায়। কখন কখন স্বর্ণ ও রৌপ্যের সহিত মিশ্রিত অবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

৬ষ্ঠ, রঙ্গ বা টিন্। এই ধাতু খনিমধ্যে রাসায়নিক মিশ্ররূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়। লৌহের চাদর রঙ্গ মধ্যে ডুবাইয়া লইলে অতি উজ্জ্বল হয় এবং মরিচা ধরে না। তাহাতেই সচরাচর টিনের দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

৭ম, সীসক। সীসক গন্ধকের সহিত মিশ্রিত অবস্থায় বহুল পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। সীসক অত্যন্ত কোমল ধাতু, এমন কি নখ দিয়া খুঁটিয়া লওয়া যায়। কাগজে অঙ্কপাত করিলে কাল দাগ পড়ে। এই জন্য ইহাতে লিখিবার পেন্সিল প্রস্তুত হয়। জল ১০০ ডিগ্রী (সেণ্টিগ্রেড্ থার্ম্মোমিটর) তাপ পাইলেই ফুটিতে থাকে, কিন্তু সীসক ৩৩০ হইতে ৩৩৫ ডিগ্রী উত্তাপে গলিয়া যায়।

পরিস্রুত জলের ভার হইতে ইহার ভার ১১·৩ গুণ; অর্থাৎ অগ্নিতে যন্ত্রদ্বারা চুয়াইয়া যে জল বাহির হয়, সেই জল একটা পাত্রে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিলে সেই জলের যত ভার হইবে, সেই পাত্রে গলিত সীসক পরিপূর্ণ করিয়া রাখিলে তাহা যখন জুড়াইবে তখন ঐ সীসার ভার উক্ত জলের ভার অপেক্ষা ১১$\frac{৩}{১০}$ গুণ অধিক হইবে।

৮ম, লৌহ। লৌহ প্রচুর পরিমাণে নানা স্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই মূলপদার্থ সূক্ষ্মরূপে প্রায় সকল মৃত্তিকাতেই অবস্থিতি করে; এই জন্য মৃত্তিকা দগ্ধ করিলে রক্তবর্ণ হয়। প্রাণীদিগের রক্ত মধ্যে লৌহের অংশ আছে। লৌহ বিশুদ্ধ অবস্থায় প্রায় পাওয়া যায় না;

প্রক্রিয়া বিশেষ দ্বারা বিশুদ্ধ করিয়া লওয়া হয়। এই বিশুদ্ধ লৌহকে ইস্পাত বা তীক্ষ্ণ লৌহ কহে। কান্ত লৌহ, অর্থাৎ যাহাতে কটাহ প্রভৃতি প্রস্তুত হয়, তাহাতে কিয়ৎপরিমাণে কার্ব্বন্ মিশ্রিত থাকে। ইহা পরিশ্রুত জল অপেক্ষা ৭·৮৪ হইতে ৮·১৩৯ গুণ পর্য্যন্ত ভারী হয়।

পূর্ব্বোক্ত অষ্টবিধ মূলধাতু ব্যতীত প্লাটিনাম্, নিকেল্ প্রভৃতি মূল-ধাতু আছে। তাহাদের সচরাচর প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না। ধাতু বলিলে বাঙ্গালায় এই অর্থ বুঝায় যে, যে সকল পদার্থ অগ্নিতাপে বিকৃত হয় না এবং আঘাত সহ্য করিতে পারে; অর্থাৎ যাহা পিটিয়া পাত করা যাইতে পারে। ধাতু ভিন্ন অপর অনেক খনিজ মূলপদার্থ আছে, যথা, গন্ধক, সোডা, সোহাগা, আইওডিন্, ক্লোরাইন্, ম্যাগনেসিয়াম্, কার্ব্বন্ ইত্যাদি।

কার্ব্বন্ নামে যে মূলপদার্থ তাহা বিশুদ্ধ অবস্থায় হীরকরূপে পাওয়া যায়। **হীরক,** অতি বহুমূল্য পদার্থ হইবার কারণ ইহার উজ্জ্বলতা। বর্ণশূন্য অর্থাৎ সাদা হীরকেরই মূল্য অধিক, কিন্তু চুনি রক্তবর্ণ, পান্না সবুজবর্ণ, নীলা বা নীলকান্ত নীলবর্ণ হইলেও যদি দৃশ্য সুন্দর হয়, তাহা হইলে ইহারাও বহুমূল্য হইয়া থাকে। অনেকের মুখে প্রবাদ শুনা যায় যে হীরক পাথুরিয়া কয়লার ভিতর পাওয়া যায়, কিন্তু এই প্রবাদের মূলে যদি কিছু সত্য থাকে তাহা হইলে তাহা এই যে হীরক বিশুদ্ধ কার্ব্বন্ পদার্থ এবং পাথুরিয়া কয়লা অবিশুদ্ধ কার্ব্বন্ পদার্থ। কিন্তু হীরক পাথুরিয়া কয়লার খনিতে পাওয়া যায় না। ভারতবর্ষ, আফ্রিকা প্রভৃতি স্থানে হীরকের খনি আছে, তথায় উজ্জ্বল নুড়ি পাথর সমূহ অনুসন্ধান করিতে করিতে দৈবাৎ হীরক পাওয়া যায়। ভারত-বর্ষের অনেক নদীতে জলপ্রবাহের সহিত হীরক পর্ব্বতাদি হইতে নির্গত হইয়া থাকে। গ্রাফিট্ বা উজ্জ্বল নানাবর্ণ নুড়ি পাথরেও বিমিশ্রভাবে কার্ব্বন্ অবস্থিতি করে। এই প্রস্তর চূর্ণ করিয়া নানাবিধ শিল্প সামগ্রী

প্রস্তুত হয়। গ্রাফিট্ প্রস্তর কাটিয়াই আগ্রাস্থ তাজমহলের নানাবর্ণ চিত্র বিচিত্র, লতা পাতা, ফুল ফল প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে।

পাথুরিয়া কয়লায় কার্ব্বন্, অক্সিজন্, ও হাইড্রোজন এই ত্রিবিধ মূলপদার্থ অবস্থিতি করে। পৃথিবীর স্থানে স্থানে যে পাথুরিয়া কয়লার খনি আছে তাহা অতি পূর্ব্বকালে অরণ্যময় ছিল; ক্রমে জলপ্লাবনে ঐ সকল অরণ্য বিনষ্ট ও মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত হইয়া যায়। ঐ সকল অরণ্যস্থ বৃক্ষসমূহ কয়লারূপে পরিণত হইয়া রহিয়াছে।

বীবর।

অনেকেই বীবরের কোট্ প্রভৃতি শীতাবরণ রূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন। যে জীবের গাত্রলোমে উক্তরূপ গাত্রাবরণ নির্ম্মিত হয় তাহাকেই বীবর কহিয়া থাকে; তাহার নামানুসারেই "বীবর কোট্" প্রভৃতি নাম প্রদত্ত হইয়াছে। আমেরিকা এই অদ্ভুত জীবের আদি স্থান। অনেকে একত্র হইয়া ইহারা স্বীয় বাসগৃহ নির্ম্মাণ বিষয়ে যেরূপ নৈপুণ্য প্রকাশ করে তাহা আলোচনা করিলে বোধ হয় ইহারা পাশকরা ইঞ্জিনিয়ার। ইহাদের আকৃতি অধিক বড় নয়; উর্দ্ধে প্রায় এক হাত এবং দৈর্ঘ্যে প্রায় দেড় হাত। ইহাদের চারিখানি পদ ও একটী শল্কাবৃত পুচ্ছ থাকে। সর্ব্বাবয়ব লোমে আবৃত; দন্ত সুদৃঢ় করাতের ন্যায়। এই দন্তদ্বারা ইহারা বৃক্ষচ্ছেদন করে এবং স্রোতের জলে ভাসাইয়া গৃহকরণার্থ নির্দ্দিষ্ট স্থানে লইয়া যায়। নদী সরোবরাদির তটে ইহারা গৃহ নির্ম্মাণ করে। কাষ্ঠ, প্রস্তর ও মৃত্তিকাদ্বারা ইহারা গৃহ নির্ম্মাণ করে। গ্রীষ্মকালে জল শুষ্ক হইবার সম্ভাবনা থাকিলে উহারা গৃহের অনতিদূরে এক সেতু অর্থাৎ বাঁধ নির্ম্মাণ করে। যদি স্থির প্রবাহ হয় তাহা হইলে সরল ভাবে সেতু নির্ম্মাণ করে কিন্তু প্রবাহ প্রবল হইলে বক্র করিয়া সেতু নির্ম্মাণ করে। বক্র সেতুর

বহির্ভাগ প্রবাহ মধ্যে থাকিলে তাহা শীঘ্র ভগ্ন হয় না, ইহা যেন ভগবান্ তাহাদের কাণে কাণে শিক্ষা দিয়া যান। ইহারা বৃক্ষের বল্কল ভক্ষণ করে এবং জল স্থল উভয়েই থাকিতে পারে। ইহারা বৃক্ষাদির শাখা আনিয়া গৃহসমীপে জলমধ্যে অসময়ের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখে। পাছে স্রোতে ভাসিয়া যায় এইজন্য তাহার উপর প্রস্তরখণ্ড সমূহ চাপাইয়া রাখে। ইহার লোম বহুমূল্য, তজ্জন্য শিকারীরা ইহাদিকে বিনাশ করে।

পুত্তিকা।

অনেকেই "রুই" পোকা সন্দর্শন করিয়াছেন। উহাদের মধ্যে কোন কোন জাতি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া কাষ্ঠময় দ্রব্যাদি ও পুস্তক সমূহ বিনষ্ট করিয়া ফেলে। অপর এক জাতীয় রুই আছে। তাহারা অরণ্য বা প্রান্তর মধ্যে মৃত্তিকা স্তূপ করিয়া স্বীয় বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। এই মৃত্তিকা স্তূপ ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইয়া মন্দিরাদির ন্যায় নির্ম্মিত হয়; তন্মধ্যে ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা সুন্দর প্রকোষ্ঠ অবস্থিতি করে। যে সকল রুই এই প্রকারে বাসগৃহ নির্ম্মাণ করে তাহাদিগকে সামরিক পুত্তিকা কহিয়া থাকে। সামরিক পুত্তিকা আবার তিন ভাগে বিভক্ত; শ্রামিক পুত্তিকা, সৈনিক পুত্তিকা ও বিশিষ্ট পুত্তিকা। শ্রামিক পুত্তিকাগণ গৃহাদি নির্ম্মাণ করে, সৈনিক পুত্তিকারা গৃহের রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং বিশিষ্ট পুত্তিকারা কিছুই না করিয়া বাবুর মত আলস্যে কাল-হরণ করে। শ্রামিক পুত্তিকা অপেক্ষা সৈনিক পুত্তিকাগণ আকৃতিতে প্রায় ১৪।১৫ গুণ বৃহৎ এবং বিশিষ্ট পুত্তিকারা সৈনিক পুত্তিকা অপেক্ষা দ্বিগুণ বৃহৎ। বিশিষ্ট পুত্তিকাদিগকে অপর পুত্তিকাগণ সম্মান করে এবং রাজা ও রাণীর পদবী প্রদান করে। বিশিষ্ট পুত্তিকাদিগের কালক্রমে পক্ষ নির্গত হয় এবং আকাশে উড়িতে আরম্ভ করে। তখন নানারূপে উহারা বিনষ্ট হইয়া যায়। যদি দৈবাৎ দুই চারিটা রক্ষা পায়, তাহা হইলে অপর পুত্তিকাগণ উহাদিগকে যত্নপূর্ব্বক এক প্রকোষ্ঠ মধ্যে স্থাপন করে।

পুত্তিকামহিষী যখন গর্ভবতী হয় তখন তাহাদের আকারের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হয়; তাহাদের উদর এত বৃহৎ হয় যে তাহার শরীর স্বীয় স্বামীর অপেক্ষা প্রায় সহস্রগুণ বৃদ্ধি পায়। এক একটা পুত্তিকা-মহিষী ২৪ ঘণ্টায় প্রায় ৮০০০০ অণ্ড প্রসব করে। সর্ব্বাপেক্ষা পুত্তিকাগণের

বাসগৃহের চমৎকার পারিপাট্য দৃষ্টিগোচর হয়। উহাদের মৃত্তিকা স্তূপকে বল্মীক কহিয়া থাকে; আমাদের দেশ অপেক্ষা আফ্রিকা খণ্ডের বল্মীক অত্যন্ত উন্নত হয়, এমন কি আট দশ হাত পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়া থাকে। যাহারা বল্মীক নির্ম্মাণ করে তাহাদের দেহের সহিত বল্মীকের উচ্চতা তুলনা করিলে দেখা যায় যে উহারা স্বদেহ অপেক্ষা প্রায় সহস্রগুণ উচ্চ গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। আফ্রিকার পিরামিড্ সমূহের মধ্যে যেটা সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত তাহা মনুষ্য অপেক্ষা ৮০ গুণের অধিক উন্নত নহে, কিন্তু তাহাই মনুষ্যকীর্ত্তির চরম উৎকর্ষ বলিয়া লোকে বিস্মিত হয়। যে অনুপাতে বল্মীক নির্ম্মিত হয়, সে অনুপাতে মনুষ্যের বাসগৃহ এক একটা ৪০০০ হাত উচ্চ হওয়া উচিত। অতএব দেখ পুত্তিকাগণ স্থাপত্য বিদ্যায় মনুষ্যকেও পরাস্ত করিয়াছে।

৩য় খণ্ড।

আকাশ।

সৌর-জগৎ।

মীন
নেপচুন
কুম্ভ
মেষ
শনির কক্ষ
মকর
মঙ্গলের কক্ষ
পৃথিবী
চন্দ্র
মঙ্গল
শুক্র
পৃথিবীর কক্ষ
বুধের কক্ষ
রবি
বুধ
শনি
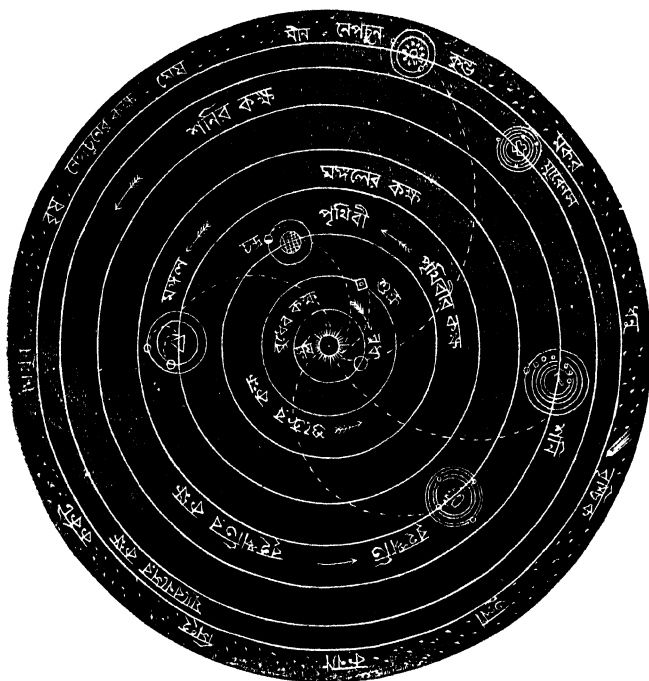
অন্তরীক্ষ সম্বন্ধীয় আশ্চর্য্য বিবরণ।

আকাশ।

সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহগণ ও অসংখ্য নক্ষত্ররাজি যেমন নভোমণ্ডলে শোভা পাইতেছে, আমাদের অধিষ্ঠানভূতা এই পৃথিবীও তদ্রূপ শূন্যে বিরাজমানা রহিয়াছে। আমরা যেমন পৃথিবীতে থাকিয়া চন্দ্র সূর্য্যাদি নিরীক্ষণ করিতেছি তদ্রূপ যে সমস্ত অধিবাসী চন্দ্র সূর্য্যাদি গ্রহগণে বাস করিতেছেন তাঁহারাও আমাদের এই পৃথিবীকে আকাশে তদ্রূপ দেখিতেছেন। অন্যান্য গ্রহগণের সহিত এই পৃথিবী শূন্যে কিরূপ ভাবে ও কোন স্থানে অবস্থিতি করিতেছে তাহা পার্শ্বের চিত্রের দিকে নিরীক্ষণ করিলে সহজেই বোধগম্য হইবে। এক্ষণে আমাদের জানা উচিৎ যে শূন্যে এই পৃথিবী কিরূপে রহিয়াছে, পড়িয়া যায় না কেন? ইহার উত্তর এই যে মাধ্যাকর্ষণের গুণেই আমাদের এই পৃথিবী স্থানভ্রষ্ট হয় না। এক্ষণে মাধ্যাকর্ষণ কি তাহা জানা আবশ্যক।

মাধ্যাকর্ষণ।

কোন বস্তু আকাশে নিক্ষেপ করিলে তৎক্ষণাৎ তাহা ভূমিতলে পতিত হয়। বস্তু সমূহের এইরূপ পতন দেখিয়া আমাদের দেশের গণিতজ্ঞ পণ্ডিত ভাস্করাচার্য্য এবং বিলাতের পণ্ডিত নিউটন সাহেব পক্ক আতার পতন দেখিয়া, কি জন্য বস্তু সকল নিম্নে পতিত হয় তাহা নির্ণয় করিতে আরম্ভ করেন; এবং সিদ্ধান্ত করেন যে জগতের সমস্ত পদার্থেরই এই এক গুণ আছে যে তাহা নিজের দিকে অপর সকল বস্তুকেই আকর্ষণ করিয়া থাকে। এই জন্য পৃথিবী ও পৃথিবীস্থিত সমস্ত পদার্থই পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করিতেছে। বস্তু মাত্রেরই

এই গুণকে মাধ্যাকর্ষণ কহে। কারণ সকল বস্তুই স্বীয় মধ্যস্থল হইতে উক্ত আকর্ষণ শক্তি প্রয়োগ করিয়া থাকে। এই শক্তির প্রভাবে বস্তু সমূহের ভার অনুভব হয়। কারণ যে দ্রব্যে যত অধিক পরমাণু বিদ্যমান থাকে সে বস্তুকে পৃথিবী তত অধিক বলে আকর্ষণ করে। এই মাধ্যাকর্ষণের গুনেই সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহগণ শূন্যোপরি আকাশে অবস্থিতি করিতেছে।

এই আকাশ মণ্ডল অপরিসীম, ইহার আদিও নাই অন্তও নাই। এই অনন্ত আকাশে অসংখ্য নক্ষত্ররাজি এবং চন্দ্র সূর্য্যাদি গ্রহগণ কেমন সুন্দর ভাবে অবস্থিতি করিতেছে। ইহারা নিজে নিরাধার হইয়া অসংখ্য জীবের আধারস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। ঐ যে অসংখ্য নক্ষত্র রাজি নীলাকাশে রাত্রে ঝিকি ঝিকি করে উহারাও এক একটী পৃথিবী বা সূর্য্যের মত। এই পৃথিবীতে যেমন অসংখ্য জীব বাস করে ঐরূপ ঐ সমস্ত নক্ষত্র মধ্যেও কত জীব বাস করে। এইরূপ অসংখ্য পৃথিবীর সমষ্টি লইয়া এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হইয়াছে। এই পৃথিবী কত বড় দেখিতেছ কিন্তু অনন্ত আকাশের এক স্থানে এই পৃথিবী একটী সামান্য সর্ষপবৎ পদার্থ মাত্র। আমাদের শাস্ত্রে বলে যে অনন্ত দেবের উপর এই পৃথিবী অবস্থিত। ইহার অর্থ আর কিছুই নহে জগতে আকাশই অনন্ত, নচেৎ আর কিছুই অনন্ত হইতে পারে না। এক্ষণে আশ্চর্য্য বোধ হইবে যে শূন্যের উপর এই পৃথিবী কিরূপে থাকিতে পারে। কিন্তু পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, অপর বস্তু সমূহ পৃথিবীর আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া ভূতলে সংলগ্ন রহিয়াছে। এক্ষণে পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহগণ মাধ্যাকর্ষণ প্রভাবে পরস্পর টানা টানি করিতেছে। সূর্য্য এক প্রকাণ্ড তীক্ষ্ণ জ্যোতির্ম্ময় গোলাকার পদার্থ এবং পৃথিবী অপেক্ষা ১৪ লক্ষগুণ বড়, সুতরাং তাহার মাধ্যাকর্ষণ শক্তিও তদ্রূপ। এই কারণে সূর্য্য পৃথিবীকে নিজের দিকে টানিতেছে ও অনায়াসে একেবারে টানিয়া লইতেও পারে; কিন্তু

সূর্য্য অতি দূরে বর্ত্তমান রহিয়াছে বলিয়া তাহার আকর্ষণে পৃথিবী তদভিমুখে গমন করিতে পারিতেছে না। সূর্য্য যে অতিদূরে অবস্থিতি করিতেছে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়, কারণ যে সূর্য্য এত প্রকাণ্ড তাহা পৃথিবী হইতে একখানি থালার মত দেখায়। এতদূরে থাকাতে সূর্য্য পৃথিবীকে যদিও নিজের দিকে টানিয়া লইতে পারিতেছে না তথাপি তাহার আকর্ষণ অবশ্যই পৃথিবীকে পাইতে হইতেছে। সেই আকর্ষণ পাইয়া পৃথিবী স্বীয় আকর্ষণ দ্বারা উহাকে পরাভূত করিবার চেষ্টা করিতেছে। ইহাতে পৃথিবীর দুইটী বেগ সমুৎপন্ন হইতেছে একটী বেগ সূর্য্যাভিমুখী ও অপর বেগ সূর্য্য হইতে দূরাভিমুখী।

এই উভয় বেগের মধ্যবর্ত্তী হওয়াতে পৃথিবীমণ্ডল মণ্ডলাকার পথে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। যেমন একখানি প্রস্তর খণ্ডে রজ্জু বন্ধন পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে ঘুরাইলে দেখা যায় যে, এক সময়েই রজ্জু প্রস্তর খণ্ডকে টানিতেছে ও প্রস্তর খণ্ড রজ্জুকে টানিতেছে, তজ্জন্য প্রস্তর খণ্ড পড়িয়াও যাইতেছে না, হস্তের নিকটও আসিতেছে না; তদ্রূপ পৃথিবী উভয় বেগের মধ্যবর্ত্তী হওয়াতে কোথাও যাইতে না পারিয়া পরিভ্রমণ করিতেছে। পৃথিবীর সূর্য্যাভিমুখী বেগকে আকর্ষণী শক্তি ও তাহার বিপরীত বেগকে বিক্ষেপণী শক্তি কহিয়া থাকে। আমরা মনে করি যে পৃথিবী স্থিরা এবং সূর্য্য ভ্রমণ করিতেছে কিন্তু তাহা নহে, সূর্য্য অন্যান্য গ্রহগণের ন্যায় ভ্রমণ করে না এক স্থানে স্থির হইয়া থাকে। কিন্তু চন্দ্র পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে। এক্ষণে বুঝিয়া দেখ এই মাধ্যাকর্ষণ শক্তি প্রভাবে সর্ব্বনিয়ন্তা সেই ভূতভাবন ভগবানের কৃপায় অনন্তাকাশে গ্রহগণ কেমন শূন্যে অবস্থিত রহিয়াছে, এই মাধ্যাকর্ষণ শক্তি না থাকিলে গ্রহগণ যে কে কোথায় পরস্পর সংঘর্ষণে চূর্ণ বিচূর্ণ হইত কিংবা কোথায় গমন করিত তাহার নিরাকরণ হইত না।

পৃথিবীর আকার।

এক্ষণে আমাদের পৃথিবীর আকার প্রকার ও গতিবিধি জানা আবশ্যক। বাল্যকাল হইতে সকলেই শুনিয়া আসিতেছেন যে এই পৃথিবীর আকার গোল, উত্তর ও দক্ষিণদিকে কিঞ্চিৎ চাপা। পৃথিবী যে গোল তাহার বিশেষ কোন প্রমাণ না দিয়া কেবলমাত্র একটি দৃষ্টান্ত দেখাইলেই যথেষ্ট হইল।

পৃথিবীর যে অংশেই গমন করিবে সেই অংশেই চারিদিক চাহিয়া দেখিলে বোধ হইবে যে আকাশ মণ্ডল গোলাকার হইয়া চতুর্দ্দিকে যেন ভূমি স্পর্শ করিয়াছে, এবং নিম্নস্থিত ভূমিখণ্ড গোলাকার বৃহৎ থালার ন্যায় বোধ হইবে। ইহাতেই পৃথিবী গোলাকার বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যায়। এক্ষণে দেখ, পৃথিবী যেন এক বৃহৎ বর্ত্তুল, ইহার উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তে একটু চাপা আছে। এই পৃথিবীর উপর অংশে সমুদ্র, নদী, পর্ব্বত প্রভৃতি অবস্থিত এবং জীবগণ এই বৃহৎ বর্ত্তুলের গাত্রো'পরি ভ্রমণ করিয়া থাকে। পৃথিবীর অভ্যন্তরে মৃত্তিকা, জল প্রভৃতি অবস্থিত, অধিকতর অভ্যন্তরে অগ্নিময় তরল পদার্থে পরিপূর্ণ। যেমন নারিকেল ফলের উপরভাগ কঠিন ও অভ্যন্তর তরল, পৃথিবীও তদ্রূপ। এই পৃথিবীর ঠিক মধ্যস্থল ভেদ করিয়া যদি একটা শলাকা এক পৃষ্ঠ হইতে অপর পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট করা যায়, তাহা হইলে ঐ শলাকার পরিমাণ ৮০০০ মাইল এবং যদি কোন রজ্জু পৃথিবীর ঠিক্ মধ্যস্থান বেষ্টন করে তাহা হইলে ঐ রজ্জুর পরিমাণ প্রায় ২৫০০০ মাইল। পৃথিবীর উক্ত শলাকাবিদ্ধ অংশকে পৃথিবীর ব্যাস কহে, এবং পৃথিবীর উক্তরূপ বেড়কে পরিধি কহিয়া থাকে। পৃথিবীর উত্তর প্রান্তকে সুমেরু ও দক্ষিণ প্রান্তকে কুমেরু কহে। পৃথিবীর ঠিক্ মধ্যস্থলে পূর্ব্ব-পশ্চিমব্যাপী যে পরিধি তাহাকে বিষুবরেখা

কহে। পৃথিবীকে সমান ৩৬০ অংশে বিভাগ করিলে এক এক অংশকে ডিগ্রী কহে। বিষুবরেখার উত্তর বা দক্ষিণ অংশ মেরু পর্য্যন্ত পরিমাণ করিলে ৯০ ডিগ্রী হয়; এইরূপে পৃথিবীর এক পৃষ্ঠ সমস্ত ১৮০ ডিগ্রী এবং অপর পৃষ্ঠ ১৮০ ডিগ্রী। বিষুবরেখা হইতে উত্তরাংশ ৯০ ডিগ্রীকে "নর্থ ল্যাটিচিউড্" এবং দক্ষিণাংশ ৯০ ডিগ্রীকে "সাউথ ল্যাটিচিউড্" কহিয়া থাকে। পৃথিবীর মধ্যস্থিত যে কোন স্থান হইতে পূর্ব্ব দিকে ১৮০ ডিগ্রী ও পশ্চিম দিকে ১৮০ ডিগ্রী অবশ্যই আছে। ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডন নগরের সমীপবর্ত্তী গ্রীণ উইচ্ নামক স্থান হইতে ইংরাজেরা পূর্ব্ব পশ্চিমের ডিগ্রী গণনা করিয়া রাখিয়াছেন; ঐ স্থানের পূর্ব্ব ১৮০ ডিগ্রীকে "ইষ্ট লঙ্গিচিউড্" এবং পশ্চিম ১৮০ ডিগ্রীকে "ওয়েষ্ট লঙ্গিচিউড্" কহিয়া থাকে।

পৃথিবীর গতি।

পৃথিবী যে স্থিরা নয়, অতি প্রবলবেগে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে, অথচ আমরা কিছুই অনুভব করিতে পারি না, তাহার কারণ এই যে, পৃথিবী ভ্রমণ করিবার সময় শকটাদিবৎ কম্পিত হয় না। যদি স্থির নদীতে নৌকা গমন করে তাহা হইলে নৌকা মধ্যস্থ প্রকোষ্ঠ মধ্যে অবস্থান করিলে নৌকা যাইতেছে কিনা অনুভব হয় না, কিন্তু তীরে দৃষ্টিপাত করিলে বৃক্ষাদি নৌকার বিপরীত দিকে গমন করিতেছে বলিয়া বোধ হয়। এই পৃথিবীও তদ্রূপ শূন্যোপরি পরিভ্রমণ করায় কোনরূপ আঘাত বা ঘর্ষণাদি প্রাপ্ত না হওয়াতে ইহার গতি অনুভব করা যায় না। বিশেষ একটী জালা ঘুরাইলে যেমন একটী পিপীলিকা কিছুই অনুভব করিতে পারেনা, তদ্রূপ সেই তুলনায় এই পৃথিবীর নিকট আমরা পিপীলিকা হইতেও বহু বহু ক্ষুদ্র। পৃথিবী পশ্চিমদিক হইতে পূর্ব্বদিকে আবর্ত্তন করিতেছে, তাই সূর্য্যকে পূর্ব্বদিক হইতে পশ্চিমদিকে গমন করিতেছে বলিয়া অনুভব করি।

পৃথিবী যে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে তাহাতেই ঋতুভেদ ও বৎসর হইয়া থাকে। সূর্য্যকে সম্যক্ প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতে পৃথিবীর ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা লাগিয়া থাকে, এইজন্য ঐ সময়ে আমাদের এক সম্বৎসর হয়। পৃথিবী যে পথে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে তাহা সম্পূর্ণ গোলাকার নহে, যদি সম্পূর্ণ গোলাকার হইত তাহা হইলে ৩৬০ দিনে বৎসর হইত, কিন্তু উক্ত পথ কিয়ৎ পরিমাণে ডিম্বাকৃতি হওয়ায় ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টায় সম্বৎসর হইয়া থাকে। পূর্ব্বকার লোকে ৩৬০ দিনেই বৎসর গণনা করিতেন। ইয়ুরোপে রোমীয় সম্রাট্ জুলিয়াস্ সিজার সর্ব্ব প্রথম ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টায় বৎসর গণনা করিবার আদেশ করেন, এবং কোন্ মাস কত দিনে শেষ হইবে তাহা স্থির করিয়া দেন। প্রতি বৎসর ৬ ঘণ্টা করিয়া বাকী থাকে, এইজন্য প্রতি চারি বৎসরের শেষ বৎসরে ৩৬৬ দিনে বৎসর গণনার ব্যবস্থা করেন ও ফেব্রুয়ারি মাস ২৮শে না হইয়া ২৯শে হইবার বিধান প্রবর্ত্তিত করেন। এই ব্যবস্থায় ইয়ুরোপের অজ্ঞ শ্রমজীবীরা প্রথমে বড়ই অসন্তুষ্ট হয়, কারণ, তাহারা মনে করে যে, ভদ্রলোকেরা মিলিত হইয়া তাহাদের অতিরিক্ত পরিশ্রম করাইয়া লইবার জন্য ৩৬০ দিনের স্থলে ৩৬৫ দিনে বৎসর স্থির করিয়াছেন।

কিন্তু ঠিক্ যে ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টায় সম্বৎসর হয় তাহা নহে, তাহার কএক মিনিট্ কম; মোটামুটি হিসাবে ঠিক্ ৬ ঘণ্টা ধরা হইয়াছে। কিন্তু বহুকালে ঐ কয়েক মিনিট জমা হইয়া দিন, মাস ও বৎসরে পরিণত হইতে পারে। ইহাতেও বহুকালে হিসাবের গোলমাল হইতে পারে এই ভাবিয়া রোমীয় ধর্ম্মাধিপতি পোপ গ্রেগারি নিয়ম করেন যে প্রত্যেক শতাব্দীর শেষ বৎসর “লিপ্ ইয়ার” হইবে না, অর্থাৎ সে বৎসর জুলীয় বিধান মতে ৩৬৬ দিনে বৎসর না হইয়া ৩৬৫ দিনেই বৎসর হইবে। এবং তিনি বিগত পনর শত বৎসরের হিসাব ঠিক্

করিয়া লইবার জন্য এরূপ বিধান করেন যে, ১লা জানুয়ারি গণনা না করিয়া সে বৎসর একেবারে ১৬ই জানুয়ারি হইতে গণনা আরম্ভ হইবে। এবারে শ্রমজীবীরা মহা আনন্দিত হয়, কারণ তাহারা ১৫ দিন খাটিয়া এক মাসের বেতন পাইবে।

দিবা ও রাত্রি।

এক্ষণে কি কারণে দিবা ও রাত্রি, শীত ও গ্রীষ্ম হয় তাহা বিবৃত হইতেছে। বৃহৎ বর্ত্তুলাকার পৃথিবী শূন্যমধ্যে থাকিয়া শূন্যমধ্যস্থ সুবৃহৎ সূর্য্যের চতুর্দ্দিক যে পরিভ্রমণ করিতেছে, তাহা বিবৃত করা হইল। কোন বর্ত্তুলকে গড়াইয়া গড়াইয়া যদি কোন বস্তুর চতুর্দ্দিকে ঘুরাইয়া আনা যায়, তাহা হইলে দেখিবে যে ঐ বর্ত্তুলের উপরিভাগ নীচে যাইতেছে এবং নীচের ভাগ উপরে যাইতেছে। পৃথিবী ঐ ভাবে গড়াইয়া গড়াইয়া সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, ইহাতে পৃথিবী এক দিক্ সূর্য্যের দিকে ও অপর দিক্ সূর্য্য হইতে অন্তরালে গমন করিতেছে; ক্রমান্বয়ে সকল পৃষ্ঠই সূর্য্যের অভিমুখে গমন করিয়া তাহা হইতে অন্তরালে গমন করিতেছে।

যে পৃষ্ঠ সূর্য্যাভিমুখে আইসে সেই পৃষ্ঠে দিবা হয় এবং যে পৃষ্ঠ সূর্য্য হইতে অন্তরালে গমন করে, সেই পৃষ্ঠে রাত্রি হইয়া থাকে। পৃথিবী পশ্চিমদিক হইতে পূর্ব্বদিকে আবর্ত্তন করিতেছে, এই জন্য সূর্য্য পূর্ব্বদিকে উদয় হইয়া পশ্চিম দিকে অস্তগমন করে বলিয়া বোধ হয়। পৃথিবীর অর্দ্ধেক খানা একেবারে সূর্য্যের দিকে ফিরান থাকায় অপর অর্দ্ধেক খানা অন্তরালে থাকে, সুতরাং ১৮০ ডিগ্রীতে দিবা ও ১৮০ ডিগ্রীতে রাত্রি হইয়া থাকে। এইজন্য আমাদের বঙ্গদেশে যখন দিবা দুই প্রহর তখন দক্ষিণ আমেরিকায় রাত্রি দুই প্রহর হইয়া থাকে। পৃথিবীর এক স্থানে যেরূপ সময় অপর স্থানে সেরূপ সময় নয়, ইহার

কারণ এই, যে স্থানে অগ্রে সূর্য্য দেখা যায় তথায় যেরূপ সময় হইবে, যে স্থলে পরে সূর্য্য দৃষ্ট হইবে, তথায় সেরূপ সময় কিরূপে হইবে? যখন আমরা সূর্য্যের গতির কথা কহিব তখন সূর্য্যের দৃশ্যমান গতিই বুঝিতে হইবে, যে হেতুক সূর্য্যের বাস্তব গতি নাই। পৃথিবীর ৩৬০ ডিগ্রী সমগ্র আলোকিত করিতে সূর্য্যের ২৪ ঘণ্টা বা ৬০ দণ্ড হয়, এই জন্য ঐ সময়ে দিবা রাত্রি হইয়া থাকে। এক্ষণে, কোন স্থানের সময় নিরূপণ করিতে হইলে সেই স্থানের ডিগ্রী জানিতে পারিলে কার্য্যসিদ্ধি হয়, কারণ ৩৬০ ডিগ্রী গমন করিতে সূর্য্যের যদি ২৪ ঘণ্টা লাগে তাহা হইলে এক এক ডিগ্রী গমন করিতে কত সময় লাগে তাহা অনায়াসেই বাহির করা যায়।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে যদি পৃথিবীর অর্দ্ধাংশে এককালে সূর্য্যালোক পতিত হয় তাহা হইলে বার মাসই দিবারাত্রি সমান হওয়াই সম্ভব, কিন্তু তাহা না হইয়া কখন দিন ছোট রাত্রি বড়, কখন রাত্রি ছোট দিন বড়, কখন বা দিবা রাত্রি সমান হইয়া থাকে, ইহার কারণ কি?

উক্ত বিষয়টী বুঝিতে হইলে একটু অধিকতর মনোযোগের আবশ্যকতা হইবে। পৃথিবী গড়াইয়া গড়াইয়া সূর্য্যের চতুর্দ্দিক পরিভ্রমণ করিতেছে তাহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। যেমন শকট-চক্র গড়াইয়া যায় পৃথিবী ঠিক্ সেইরূপ গড়াইতেছে না। একটী মৃত্তিকা বা কাষ্ঠ বর্ত্তুলের নির্ম্মাণ করিয়া তাহার ঠিক্ মধ্যস্থলে একটী শলাকা প্রবিষ্ট করাইয়া দাও। সেই শলাকার দুই মুখ যেন কিছু কিছু বহির্ভাগে বাড়ান থাকে। তৎপরে সেই শলাকাবিদ্ধ বর্ত্তুলটী ভূমিতে স্থাপন করিয়া একমুখের শলাকাটী ধরিয়া বর্ত্তুলটী একটু উচ্চ করিয়া ধর; ইহাতে অপর মুখের শলাকাংশ ভূমির উপর থাকিবে কিন্তু তোমার হস্তস্থিত শলাকাংশ তির্য্যকভাবে আকাশের দিকে মুখ ফিরাইয়া

থাকিবে। এক্ষণে ঐ শলাকাংশটী ধরিয়া বর্ত্তুলটী ঘুরাও, দেখিবে উহা ঘুরিতে ঘুরিতে চলিতেছে। এক্ষণে বর্ত্তুলের যে ভাবে গতি হইতেছে, পৃথিবীর গতিও সেই প্রকার। পৃথিবীর যদিও ঐ প্রকার শলাকা নাই ও কেহ ঘুরাইতেছে না, তথাপি উক্ত বর্ত্তুলের যে প্রকার গতি, পৃথিবী স্বতই সেই প্রকার গতি লাভ করিয়াছে। নিম্নস্থ চিত্রে দৃষ্টিপাত করিলে তাহার সম্যক্ উপলব্ধি হইবে উক্ত বর্ত্তুলের যে
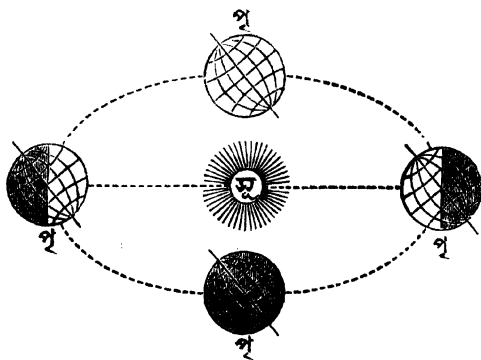
প্রান্ত তোমার হস্তে, পৃথিবীর সেই প্রান্ত উত্তর এবং বিপরীত প্রান্ত দক্ষিণ। এক্ষণে, উক্ত বর্ত্তুলটী রাত্রিকালে গৃহমধ্যাস্থিত একটী জ্বলন্ত বাতির চতুর্দ্দিকে ঐ ভাবে ঘুরাইয়া আন ; তাহা হইলে তুমি দেখিতে পাইবে ঐ বর্ত্তুলের অর্দ্ধাংশে বাতির আলো লাগিতেছে বটে, কিন্তু বর্ত্তুলটীর উর্দ্ধস্থ বা অধঃস্থ অর্দ্ধাংশে আলোকের ভাগ, হয় কম না হয় বেশী, সুতরাং দেখ উর্দ্ধ গোলকে আলোকের ভাগ অধিক হইলে নিম্নস্থ অর্দ্ধ গোলকে আলোকের ভাগ অবশ্যই কম হইয়া থাকে। যদিও সমগ্র বর্ত্তুলের অর্দ্ধাংশে আলোক লাগিতেছে বটে কিন্তু অর্দ্ধ বর্ত্তুলের অধিক ভাগে আলোক ও অল্পাংশ অন্ধকার এবং অপরার্দ্ধ বর্ত্তুলের

অল্পাংশে আলোক ও অধিকাংশে অন্ধকার থাকে। হরে দরে সমগ্র বর্ত্তুলের অর্দ্ধভাগে আলোক ও অর্দ্ধভাগে অন্ধকার থাকে। পৃথিবীতে সূর্য্যালোক ঐ ভাবে পতিত হইতেছে, এইজন্য সর্ব্বত্র দিবা রাত্রির পরিমাণ একরূপ হয় না।

পৃথিবীতে যে ঐভাবে সূর্য্যালোক পতিত হয়, তাহা আমরা অনুভবও করিতে পারি। আমরা দেখি যে, বৎসরের মধ্যে ছয় মাস সূর্য্য প্রতিদিন একটু একটু করিয়া উত্তর দিকে সরিয়া সরিয়া উদয় হয়, এবং অপর ছয় মাস একটু একটু করিয়া দক্ষিণ দিকে সরিয়া সরিয়া উদয় হয়। ডিসেম্বর মাসের ২৪শে হইতে সূর্য্য উত্তরদিকে সরিতে আরম্ভ করে এবং জুন মাসের ২৪শে হইতে সূর্য্য পুনর্ব্বার দক্ষিণদিকে সরিতে আরম্ভ করে। ইহাতে এই ফল হয় যে সূর্য্য পৃথিবীর ঠিক্ মধ্যস্থলে বরাবর উদিত না হওয়ায় উত্তরার্দ্ধ ভাগে ও দক্ষিণার্দ্ধ ভাগে সূর্য্যের গতি প্রায়ই অনুভূত হয়। যখন উত্তরার্দ্ধ ভাগে সূর্য্যের স্থিতি হয় তখন উক্ত স্থানের অধিক অংশে সূর্য্যালোক এককালে পতিত হয়, সুতরাং অল্প অংশে অন্ধকার থাকে। এইজন্য তখন ঐস্থানে দিন বড় ও রাত্রি ছোট হয়। ঐ সময় আবার দক্ষিণার্দ্ধভাগের অল্পাংশে সূর্য্যালোক পতিত হওয়ায় ঐ স্থানে দিন ছোট, রাত্রি বড় হইয়া থাকে। সূর্য্য যখন দক্ষিণার্দ্ধভাগে আইসে তখন উক্ত ক্রিয়ার বিপরীত ভাব হয়, অর্থাৎ তখন দক্ষিণার্দ্ধে দিন বড়, রাত্রি ছোট হয় এবং উত্তরার্দ্ধে রাত্রি বড়, দিন ছোট হয়। গড়পড়তায় সকল সময়েই পৃথিবীর অর্দ্ধাংশে সূর্য্য কিরণ পতিত হয় বটে; কিন্তু স্থান বিশেষে কম বেশী হওয়ায় দিনমান ও রাত্রিমানের ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। সূর্য্য ঐ রূপে দক্ষিণ ও উত্তর ভাগে গমন করিবার সময় বৎসরে দুই দিন মাত্র পৃথিবীর ঠিক্ মধ্যস্থলে উদয় হয়, তখন অবশ্যই দিবা রাত্রি সমপরিমাণ হয়। ২৩শে মার্চ ও ২৩শে সেপ্টেম্বর দিন ও রাত্রি সমান

হইয়া থাকে। পৃথিবীর মধ্যস্থল অর্থাৎ বিষুব রেখার সমীপবর্ত্তী স্থানে বারমাসই সূর্য্যকিরণ পূর্ণ অর্দ্ধাংশে পতিত হয়, এই জন্য তথায় চিরকালই দিনরাত্রি সমান হইয়া থাকে। আমাদের দেশ বিষুব রেখার উত্তরে, এই জন্য এখানে যখন দিন বড়, রাত্রি ছোট এবং গ্রীষ্ম কাল আইসে; তখন উত্তমাশা অন্তরীপ, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি বিষুব রেখার দক্ষিণস্থ স্থানে দিন ছোট, রাত্রি বড় ও শীতকাল আসিয়া থাকে। আবার শেষোক্ত স্থান সমূহে যখন গ্রীষ্মকাল আগমন করে তখন আমাদের দেশে শীতকাল হইয়া থাকে। সকল স্থলেই সূর্য্যের বাস্তব গতি বুঝায় না, পৃথিবীর গতি দ্বারা সূর্য্যের অনুভূযমান গতিই বুঝাইয়া থাকে। মেরুসন্নিহিত স্থানে ছয়মাস ক্রমাগত দিন ও ছয় মাস ক্রমাগত রাত্রি হইয়া থাকে। ল্যাপ্‌ল্যাণ্ড এবং গ্রীণল্যাণ্ডের উত্তরাংশে ঐ প্রকার ঘটনা হইয়া থাকে। ইহার কারণ এই সূর্য্য যখন উত্তরায়ণ গতির সময় বিষুব রেখার উত্তরাংশে অবস্থিতি করে তখন উত্তর মেরুপ্রান্ত ক্রমাগত সূর্য্যকিরণে আলোকিত হইতে থাকে। আমাদের এখানে প্রতিদিন যে রাত্রি হয় তাহার কারণ তো আর কিছুই নয়, পৃথিবীর নিজ দেহ দ্বারাই সূর্য্য আড়াল পড়িয়া থাকে। মেরুস্থানে পৃথিবীর নিজ দেহদ্বারা তখন আর সূর্য্য অন্তরালে গমন করে না, সেইজন্য ছয়মাস ক্রমাগত দিন হইয়া থাকে। তখন পৃথিবীর দক্ষিণ প্রান্তে ছয়মাস ক্রমাগত রাত্রি হইয়া থাকে। আবার সূর্য্য দক্ষিণায়ন গতির সময় ক্রমে বিষুব রেখার দক্ষিণাংশে অবস্থিতি করে তখন উত্তর মেরুতে রাত্রি ও দক্ষিণ মেরুতে দিন হইতে থাকে। হিন্দুদিগের শাস্ত্রে ছয়মাস দিন ও ছয়মাস রাত্রি হয়, এমন স্থানের উল্লেখ আছে।

চন্দ্র।

এক্ষণে চন্দ্রের কথা কিছু বলা যাউক। চন্দ্রও পৃথিবীর ন্যায় গোলাকার বর্ত্তুলবৎ পদার্থ এবং শূন্যোপরি অবস্থিত; কিন্তু ইহা পৃথিবী অপেক্ষা ছোট, প্রায় ৪৯ ভাগের এক ভাগ মাত্র। পৃথিবী যেমন সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে, চন্দ্র সেইরূপ পৃথিবীর চতুর্দ্দিক্ পরিভ্রমণ করিতেছে। চন্দ্রের নিজের কোন তেজ নাই, সূর্য্যকিরণ চন্দ্রোপরি পতিত হওয়ায় চন্দ্র আলোকময় দেখায়। চন্দ্রে যে কলঙ্ক দেখা যায়, উহা চন্দ্রমণ্ডলস্থ বৃহৎ বৃহৎ গহ্বর, উহাতে সূর্য্যকিরণ প্রবেশ করিতে না পারায় অন্ধকারময় থাকে, তাই মলিন দেখাইয়া থাকে। দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দেখা যায় যে চন্দ্রে বৃহৎ বৃহৎ পর্ব্বত ও উচ্চ ভূমিও বর্ত্তমান আছে। চন্দ্র অবশ্যই সূর্য্যাপেক্ষা অনেক নিকটে অবস্থিতি করিতেছে, কারণ তাহা না হইলে চন্দ্রকে অত বৃহৎ দেখাইত না। যতদূরে সূর্য্য আছে তাহার সমান দূরে চন্দ্র থাকিলে উহাকে দেখাই যাইত না। চন্দ্রে যে সকল জীব বাস করে তাহারা আকাশে আমাদের এই পৃথিবীকে কিরূপ আকৃতিতে দৃষ্টি করে তাহা পরপৃষ্ঠায় চিত্রিত হইয়াছে। তাহারা এই পৃথিবীকে এক বৃহৎ গোলপিণ্ড কখন আলোকময় ও কখনও অন্ধকারময় হইতেছে এইরূপ দেখিয়া থাকে।

এক্ষণে শুক্লপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষ কিরূপে হয় তাহা শ্রবণ কর। পৃথিবী যে ভাবে সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে চন্দ্র ঠিক্ সে ভাবে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে না। চন্দ্র পৃথিবীর দিকে চিরকাল এক মুখ ফিরাইয়া উহাকে প্রদক্ষিণ করে। রাত্রিকালে গৃহ মধ্যস্থ এক জ্বলন্ত বাতিকে সূর্য্য কল্পনা কর, তাহার কিয়দ্দূরে অপর এক ব্যক্তিকে দণ্ডায়মান রাখ এবং উহাকে পৃথিবী কল্পনা কর; তৎপরে অপর এক ব্যক্তিকে উক্ত দণ্ডায়-মান ব্যক্তির চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ করিতে বল। যে ব্যক্তি দণ্ডায়মান
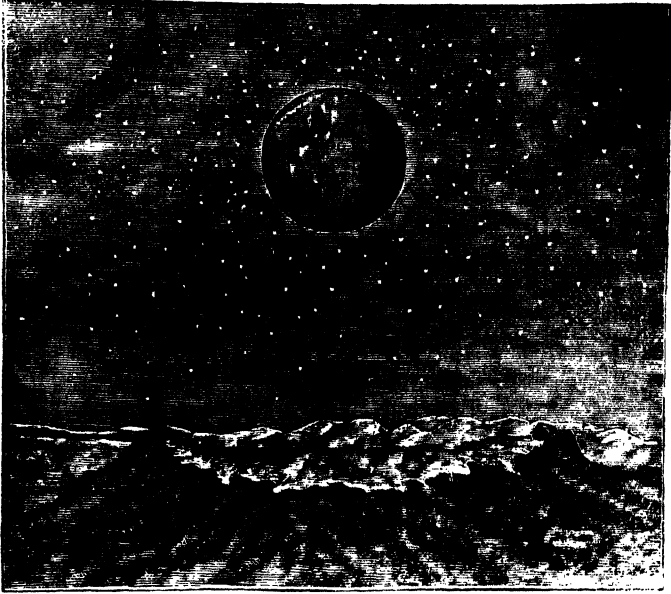
শূন্যে পৃথিবী।

ব্যক্তিকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, সে ঐ ব্যক্তির দিকে বরাবর মুখ ফিরাইয়া অবশ্যই প্রদক্ষিণ করে। এই শেষোক্ত ব্যক্তিকে চন্দ্র কল্পনা কর। প্রদক্ষিণকারী ব্যক্তি যখন আলোক ও দণ্ডায়মান ব্যক্তি উভয়ের দিকে এক কালে মুখ ফিরাইল, তখন দণ্ডায়মান ব্যক্তি দেখিবে যে বাতির আলোক প্রদক্ষিণকারী ব্যক্তির মুখে সম্পূর্ণ পতিত হইয়াছে। চন্দ্র ঐ ভাবে যখন সূর্য্য ও পৃথিবী উভয়ের দিকে এককালে মুখ ফিরায় তখনই চন্দ্র সূর্য্যালোকে সম্পূর্ণ আলোকিত হইতেছে এরূপ দেখা যায়; এই সময়কেই পূর্ণিমা কহিয়া থাকে। আবার যখন উক্ত প্রদক্ষিণকারী ব্যক্তি ক্রমশঃ পরিভ্রমণ করিতে থাকে তখন বাতির আলোক একটু একটু করিয়া তাহার মুখ হইতে সরিয়া যায়, পরে যখন বাতিকে

পৃষ্ঠভাগে রক্ষা করে তখন তাহার মুখে কিছুই আলোক পতিত হয় না। চন্দ্র এইরূপে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতে করিতে যখন সূর্য্যকে পশ্চাতে রক্ষা করে, তখন তাহার সম্মুখভাগে সূর্য্যকিরণ পতিত না হওয়ায় অমাবস্যা সংঘটিত হয়। ক্রমে আবার প্রদক্ষিণ করিবার সময় সূর্য্যালোক একটু একটু করিয়া সম্মুখভাগে লাগিতে থাকে, ইহাতেই শুক্লপক্ষ হয়। সূর্য্যালোক পূর্ণিমার পর যখন চন্দ্রমণ্ডলের সম্মুখভাগ হইতে সরিয়া যাইতে থাকে তখন কৃষ্ণপক্ষ হয়। এইরূপে দুই পক্ষে অর্থাৎ প্রায় সাড়ে ঊনত্রিশ দিনে চন্দ্র একবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে। ইহাকে চান্দ্রমাস কহে; চান্দ্রমাস সৌরমাস অপেক্ষা প্রায় ১২ ঘণ্টা কম; ইহাতে সম্বৎসরের প্রায় ১২ দিন কম হইয়া থাকে। কারণ ৩৬৫ দিনে সৌর বৎসর, আর চান্দ্র বৎসর সাড়ে ২৯ দিনের হিসাবে ৩৫৩ দিনে হইয়া থাকে। এইরূপে ২॥ বৎসরে এক মাস কম হইয়া থাকে। হিন্দুদিগের দৈব ক্রিয়াদি চান্দ্র মাসের হিসাবে হইয়া থাকে, তাঁহারা চন্দ্র ও সৌর বৎসরের ঐক্য রাখিবার জন্য আড়াই বৎসর অন্তর মলমাস বলিয়া সৌর একমাস বাদ দিয়া থাকেন। মুসলমানদিগের পর্ব্বাদিও চান্দ্রমাস হিসাবে হইয়া থাকে, কিন্তু তাঁহারা মলমাস বাদ দেন না; এই জন্য তাঁহাদের পর্ব্বদিন বৎসর বৎসর বার দিন অগ্রসরহইয়া আইসে; ইহাতে তাঁহাদের সমস্ত পর্ব্বদিন কালক্রমে বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত সকল মাসেই হইয়া থাকে। কিন্তু হিন্দুদিগের পর্ব্বদিন ২৯॥ দিনের মধ্যেই, অগ্রে বা পশ্চাতে হইবেই হইবে।

জ্ঞান বিকাশের প্রথমাবস্থায় লোকে চন্দ্রেরই আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিত; সূর্য্যের অবস্থান পরিবর্ত্তনাদি তত শীঘ্র লোকের ধারণা হয় নাই; এই কারণে লোকে এক পূর্ণিমা হইতে অপর পূর্ণিমার পূর্ব্বদিন পর্য্যন্তই প্রথম মাস গণনা আরম্ভ করে। এই জন্য "মাস" এই নাম হইয়াছে, কারণ "মস্" শব্দে চন্দ্র, তৎসম্বন্ধীয় বলিয়াই "মাস" এই নাম।

নক্ষত্র ও গ্রহ।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে এই অনন্ত আকাশের মধ্যে সূর্য্য একস্থানে স্থিরভাবে অবস্থিতি করিতেছে এবং পৃথিবী ঐ সূর্য্য হইতে বহুদূরে শূন্যোপরি বর্ত্তমান থাকিয়া স্বীয় দেহ আবর্ত্তন করত ঐ সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে; এবং চন্দ্র পৃথিবীর আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া পৃথিবীর দিকে এক মুখ ফিরাইয়া উহাকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। কিন্তু আকাশমণ্ডলে যে অসংখ্য নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায় উহারা কি ও কোথায় আছে? আমাদের এই পৃথিবী যেমন সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, অপর অনেক গোলপিণ্ডও তদ্রূপ সূর্য্যকে পরিভ্রমণ করিতেছে। উহাদের মধ্যে কতকগুলি এই পৃথিবী অপেক্ষাও বহুগুণে বৃহৎ। ঐ সকল সূর্য্য-প্রদক্ষিণকারী গ্রহ সংখ্যায় ১৫৭টী আছে, তন্মধ্যে আটটী সর্ব্ব-প্রধান, যথা, পৃথিবী, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, হার্শেল ও নেপ্‌চুন। কেহ কেহ সূর্য্য-পরিভ্রমণকারী গোলপিণ্ডসমূহকে গ্রহ কহিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা হইলে পৃথিবকেও এক গ্রহ কহিতে হয় এবং চন্দ্র ও সূর্য্যকে গ্রহ হইতে বাদ দিতে হয়। অতএব সূর্য্য-প্রদক্ষিণকারী গোলপিণ্ডমাত্রকেই বঙ্গভাষায় "গ্রহ" বলিয়া অনুবাদ করা অযুক্ত, বরং উহাদিগকে "সূর্য্য-পরিভ্রমী" বলিয়া অনুবাদ করা উচিত, কারণ ঐ সকল গোলপিণ্ডকে ইংরাজীতে প্লানেট্ (Planet) কহিয়া থাকে। বাঙ্গালায় গ্রহ শব্দের অর্থ ভিন্নপ্রকার, যাহারা গ্রহণ করে, অর্থাৎ মনুষ্যগণকে শুভাশুভ অবস্থায় আনয়ন করিবার জন্য যাহারা আক্রমণ করে তাহাদিগকেই গ্রহ কহিয়া থাকে। হিন্দুগণ সূর্য্যচন্দ্রাদি নব গ্রহকে শুভাশুভের নিয়ন্তা কহিয়া থাকেন, তাই উহাদিগকে গ্রহ কহেন। পূর্ব্বে ইয়ুরোপেও ঐ প্রকার ধারণা ছিল।

সূর্য্যপরিভ্রমী গোলপিণ্ডসমূহের মধ্যে বুধ সূর্য্যের অতি সমীপে থাকিয়া সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে এবং নেপ্‌চুন্‌ অতি দূরে থাকিয়া সূর্য্যকে পরিভ্রমণ করিতেছে। ঐ সকল "প্লানেট" পৃথিবী হইতে অবশ্যই বহুদূরে অবস্থিতি করিয়া আপন আপন মণ্ডলাকার পথে পরিভ্রমণ করিতে করিতে পৃথিবী হইতে দৃষ্ট হইয়া থাকে। উহারা অতি বৃহৎ হইলেও আমরা অতি ক্ষুদ্র দেখি। আর, আমরা যেমন একটী চন্দ্রকে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতে দেখিতে পাই, সেইরূপ উক্ত প্লানেট্‌ সমূহের মধ্যে কাহারও চারিটী, কাহারও ছয়টী এবং কাহারও বা আটটী চন্দ্রবৎ গোলপিণ্ড উহাদিগকে পরিভ্রমণ করিতেছে। উহাদিগকে অনেকে উপগ্রহ কহেন, কিন্তু তাহাও পূর্ব্বোক্ত কারণে অযুক্ত, কারণ আমাদের চন্দ্রই এক স্বয়ং গ্রহ। আমরা উহাদিগকে চন্দ্রগোলক কহিব। অপরাপর গ্রহের যে সমস্ত চন্দ্রগোলক আছে তাহা দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দর্শন করা যায়। দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দেখিলে শনিকে অধিকাংশ সময় তিনটী আলোকময় বলয়ের মধ্যবর্ত্তী হইয়া অবস্থিতি করিতেছে, এইরূপ দৃষ্ট হয়। এই দৃশ্য অতি চমৎকার ও অদ্ভুত অপর কোন গোলপিণ্ডের সেরূপ বলয় দৃষ্ট হয় না। জ্যোতির্ব্বিদ্‌ পণ্ডিতগণ কহেন, ক্ষুদ্রতর পুঞ্জ পুঞ্জ প্রস্তরাদিবৎ কঠিন পদার্থ সমূহ শনির আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া উহার চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে, তাই ওরূপ দেখায়। শুকতারা বলিয়া যে এক উজ্জ্বল তারা প্রাতঃকালের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে পূর্ব্বগগনে দৃষ্টি করা যায়, উহাই শুক্রগ্রহ। উহা পৃথিবীর কিছু নিকটে অবস্থিতি করে; বৎসরের মধ্যে কিছুদিন সন্ধ্যার সময় পশ্চিম আকাশে ও কিছুদিন শেষরাত্রিতে পূর্ব্ব আকাশে দৃষ্টিগোচর হয়। মঙ্গল গ্রহকে দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দেখিলে রক্তবর্ণ দেখায়। বুধগ্রহ যেন তরল পারদ রাশির মত দেখা যায়। বিলাতের হার্শেল নামে এক বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্‌ হার্শেল গ্রহ ও তাহার ছয়টী

চন্দ্র গোলক আবিষ্কার করেন। তাঁহার নামানুসারে উহার নাম "হার্শেল" রাখা হয়। হার্শেলের গতি নিরূপণ করিতে করিতে দুইজন অপর জ্যোতির্ব্বিদ এক সময়েই নেপ্‌চুন্ আবিষ্কার করেন।

শনি-বলয় ও ধূমকেতু।

ঐ সমস্ত সূর্য্য-প্রদক্ষিণকারী গোলপিণ্ডের অধিকাংশই পৃথিবী অপেক্ষা বৃহত্তর, ইহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, তন্মধ্যে বৃহস্পতি পৃথিবী অপেক্ষা প্রায় সাড়ে এগার হাজার গুণ বৃহৎ। সূর্য্য স্বীয় প্লানেট সমূহের সহিত এই অসীম আকাশের একস্থানে থাকিয়া স্বীয় মহিমা বিস্তার করিতেছে। তাহার তেজ ও আলোকেই ঐ সকল গোলপিণ্ড তেজোবান্ ও আলোকিত হইতেছে। সূর্য্যকে লইয়া ঐ সমস্ত গোলপিণ্ডকে সৌর-জগৎ কহিয়া থাকে। ইহার চিত্র ১১০ পৃষ্ঠায় দেখ। সৌরজগতে প্লানেট্ ব্যতীত অপর কতকগুলি বৃহৎ, অতিবৃহৎ পদার্থ অবস্থিতি
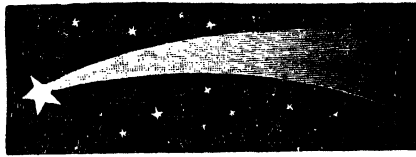
করিতেছে। উহারা বাঙ্গালায় ধূমকেতু ও ইংরাজীতে "কমেট্" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কদাচিৎ দেখা যায় যে, আকাশে নক্ষত্র সমূহের মধ্যে এক একটা এরূপ নক্ষত্র উঠে যে, তাহার পুচ্ছবৎ দীর্ঘ এক পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয়। ঐ পদার্থ লম্বা সম্মার্জ্জণীর মত বোধ হয় এবং তাহাও আলোকময় দেখায়। ঐ পুচ্ছবিশিষ্ট নক্ষত্রই ধূমকেতু। পণ্ডিতেরা কহেন ধূমকেতুর পুচ্ছ বহুল বাষ্পরাশি মাত্র এবং ধূমকেতু নিজেও ঘন বাষ্পমণ্ডল ভিন্ন আর কিছুই নয়। ধূমকেতু সমূহও সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। তবে বিশেষ এই যে, উহারা সূর্য্য পরিভ্রমণ করিতে করিতে কখন সূর্য্যের অতি দূরে কখন বা সূর্য্যের অতি নিকটে গমন করিয়া

থাকে। এই কারণে উহারা কখন আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয় এবং কখনও বা অদৃশ্য হইয়া যায়। সূর্য্যের সমীপে গমন করিলে সূর্য্যতেজে উহার ভূরি অংশ অদৃশ্যভাবে আকাশে মিলাইয়া যায়।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে যে ধূমকেতু উঠিতে আরম্ভ হয়, তাহা অনেকেরই স্মরণ আছে। উহা যখন প্রথম দেখা যায় তখন সূর্য্যোদয়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে পূর্ব্বগগনে অসাধারণ আলোকময় দীর্ঘপুচ্ছ সমেত উদয় হইতে থাকে। তখন তাহার দৃশ্য অতি বিচিত্র, তুবড়িতে অগ্নি দিলে যেমন ঊর্দ্ধগামী আলোকমালা দৃষ্টিগোচর হয়, উহাও প্রায় আকাশে তদ্রূপ দেখাইয়াছিল। পৃথিবী হইতে ঐ পুচ্ছ প্রায় ছয় সাত হস্ত দীর্ঘ বোধ হইয়াছিল। যদি পৃথিবী হইতে ঐ প্রকার দেখা যায় তাহা হইলে উহার দূরত্ব বিবেচনায় ঐ পুচ্ছ বাস্তবিক কত দূর দীর্ঘ তাহা বিবেচনা কর। ধূমকেতুর পুচ্ছ এত পাতলা হয় যে তাহার মধ্য দিয়া অপর নক্ষত্র দৃষ্ট হয়। জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতেরা গণনা করেন যে অনেকবার আমাদের এই পৃথিবী কোন কোন ধূমকেতুর পুচ্ছের মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু তথাপি পৃথিবীর লোকে তাহা জানিতে পারে নাই, কারণ ঐ পুচ্ছের বাষ্পাংশ এত পাতলা যে তাহা অনুভবই করিতে পারা যায় নাই। ধূমকেতুর ঐ প্রকার বিষম গতিপ্রযুক্ত পৃথিবী সংশয়িত অবস্থায় অবস্থিতি করিতেছে, কারণ, কালক্রমে পৃথিবীর সহিত উহার সংস্পর্শ হইলে বিষম বিপৎপাতের সম্ভাবনা। ঐ জন্য ধূমকেতুর উদয় অমঙ্গলসূচক বলিয়া ভারতবাসীরা লোকে ভীত হইয়া থাকে। কালিদাস প্রভৃতি কবিগণ ধূমকেতুকে লোকোৎপীড়নকারী বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত ধূমকেতু প্রথম প্রথম যেরূপ দীর্ঘ দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছিল, ক্রমশঃ তাহার হ্রাস হইতে লাগিল। প্রতিদিন যেমন একটু একটু করিয়া অগ্রে উদয় হইতে লাগিল, তেমনি অবয়বেও হ্রাস হইতে লাগিল; এইরূপে ক্রমে অদৃশ্য হইয়া গেল।

পূর্ব্বে যে সমস্ত গোলপিণ্ডের কথা লেখা হইল তাহাদের সংখ্যা তো অতি সামান্য। তবে আকাশে যে এত পুঞ্জ পুঞ্জ নক্ষত্ররাশি দৃষ্ট হয় উহারা কি? জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতগণ দূরবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে দৃষ্টি করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে, ঐ সকল নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে সকলগুলিই অতি বৃহৎ সূর্য্য ও পৃথিবীর মত গোলপিণ্ড; উহারা অতি দূরবর্ত্তী আকাশে বর্ত্তমান রহিয়াছে। উহাদের মধ্যে কতকগুলি সূর্য্যের মত স্থির ও কতকগুলি পৃথিব্যাদির ন্যায় পরিভ্রমণ-পরায়ণ। ঐ সমস্ত স্থির তারার মধ্যে কতকগুলি সূর্য্যাপেক্ষাও বহুগুণে বৃহৎ ও তেজঃশালী; বহুতর গোলপিণ্ড উহাদিগের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। "ডগ্ ষ্টার্" নামে একটী উজ্জ্বল তারা আমরা প্রতিদিন সন্ধ্যার পর পূর্ব্ব-দক্ষিণ আকাশে দর্শন করিয়া থাকি। জ্যোতির্ব্বিদ্গণ গণনা করেন, যে উহা সূর্য্য অপেক্ষা বহুগুণে বৃহত্তর এবং উহার তেজ সূর্য্য অপেক্ষা অনেক গুণে অধিক। যদি ঐ তারার স্থানে সূর্য্য স্থাপিত হইত, তাহা হইলে সূর্য্যকে দেখাই যাইত না; এবং যদি সূর্য্যের স্থানে ঐ তারা স্থাপিত হইত, তাহা হইলে পৃথিবী উহার তেজে তরলাবস্থা প্রাপ্ত হইত।

এই রূপ কত সূর্য্য, কত গ্রহ, কত উপগ্রহ, যে অনন্ত আকাশে অবস্থিত করিয়া সেই অনন্ত-শক্তি বিশ্বপতির মহিমা বিস্তার করিতেছে তাহা বলিবার শক্তি কাহারও নাই। আমরা আকাশে যে তারা দেখিতে পাই তাহা তো অতি সামান্য; দূরবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা ইহা অপেক্ষা বহুগুণে অধিক তারা দৃষ্ট হইয়া থাকে। আবার যে সকল স্থানে দূরবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারাও দৃষ্টি করা যায় না, তথায় যে তারা নাই, তাহা সিদ্ধান্ত করা যায় না। আকাশের মধ্যে অতি দূরে একটা এমন স্থান আছে যে তথায় নক্ষত্র পুঞ্জ দ্বারা যেন এক আলোকময় নদী দেখা যায়। উহাকে ইংরাজীতে "মিল্কিওয়ে" কহিয়া থাকে; এতদ্দেশে উহাকে স্বর্ণদী কহা

যাইতে পারে। যে সমস্ত নক্ষত্র দেখা যায় এবং স্বর্ণদীপ্তিত নক্ষত্রসমূহ যে কত বৃহৎ ও কতদূরে অবস্থিতি করিতেছে, তাহা নির্ণয় করা অতি দুঃসাধ্য। সমস্ত নক্ষত্র বোধ হয় যেন আকাশরূপ থালার মধ্যে হীরক খণ্ডের মত সাজান রহিয়াছে; কিন্তু বাস্তবিক উহারা পরস্পর অতিদূরে অবস্থিতি করিতেছে। আমাদের সূর্য্য এত দূরে থাকিলেও তাহার আলোক, সূর্য্যোদয় হইবার পর নয় মিনিটের মধ্যে পৃথিবীতে আসিয়া থাকে; আলোকের গতি এমনই দ্রুত জানিবে। কিন্তু দূরবীক্ষণ যন্ত্র সহযোগে এমন নক্ষত্র সকল আবিষ্কৃত হইয়াছে যে তাহাদের আলোক পৃথিবীতে আসিতে ৬০,০০০ ষষ্টি সহস্র বর্ষ অতীত হয়। অতএব ঐ সকল নক্ষত্রের দূরত্ব মনে ধারণা করিবার চেষ্টা কর।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে আমাদের এই সৌরজগৎ ইহার তুল্য বা ইহা অপেক্ষা বৃহৎ কত সৌরজগৎ, যে অনন্ত আকাশে অবস্থিতি করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। আকাশস্থ নক্ষত্র সমূহের মধ্যে যদি বুদ্ধিমান্ জীব থাকে তাহা হইলে তাহারাও আমাদের পৃথিবী, সূর্য্য ও অপরাপর গ্রহগণকে ক্ষুদ্র নক্ষত্র তুল্য দৃষ্টি করিয়া থাকে। এইরূপে বিবেচনা কর আমাদের সূর্য্যতুল্য পদার্থ আকাশমণ্ডলে কতই বিদ্যমান আছে। হিন্দুরা দ্বাদশ সূর্য্যের অস্তিত্ব বর্ণনা করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহারা আবার ইহাও কহেন যে সৃষ্টি প্রক্রিয়া অনন্ত। ইহাতে বোধ হয় তাঁহারা দ্বাদশ সূর্য্যের অস্তিত্ব নয়নগোচর করিয়াছিলেন।

গ্রহণ।

সকলেই সূর্য্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, কিন্তু কিরূপে গ্রহণ হয়, তাহা অনেকে অবগত নহেন। হিন্দুগণের পুরাণে বর্ণিত আছে যে রাহু নামে এক দানব আছে, সেই সূর্য্য ও চন্দ্রকে গ্রাস করে তাই গ্রহণ হইয়া থাকে। কিন্তু জ্যোতিষ শাস্ত্রে আবার রাহু ও কেতু

গ্রহ বলিয়া বর্ণিত আছে। ইহাতে সিদ্ধান্ত করা যায় যে রাহু বলিয়া যদি কোন পদার্থ থাকে, তাহা পৃথিবী ও চন্দ্রের ছায়া মাত্র। এক্ষণে কিরূপে গ্রহণ হয় তাহার জ্যোতিষ শাস্ত্র সম্মত প্রকৃত কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে চন্দ্র নিজে তেজোময় নহে, সূর্য্যের কিরণ উহাতে পতিত হওয়াতেই উহা তেজোময় দেখায়; এবং ইহাও কথিত হইয়াছে যে, চন্দ্র পৃথিবীর দিকে চিরকাল একমুখ ফিরাইয়া শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষে সমগ্র পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতেছে। চন্দ্রকে যে প্রতিদিন উদয় হইতে ও অস্ত গমন করিতে দেখা যায়, তাহা কেবল পৃথিবীর দৈনিক আবর্ত্তন বশতঃ হইয়া থাকে। যদি পৃথিবী স্থির থাকিত তাহা হইলে পনর দিবস ক্রমাগত চন্দ্রকে দেখা যাইত এবং অপর পনর দিবস উহাকে মূলেই দেখা যাইত না। এক্ষণে দেখ পূর্ণিমার সময় যখন চন্দ্র পৃথিবী ও সূর্য্য উভয়ের দিকে মুখ ফিরাইয়া অবস্থিতি করে, তখন চন্দ্র, পৃথিবী ও সূর্য্য একপ্রকার সমসূত্রপাতন্যায়ে অবস্থিতি করে। তখন কদাচিৎ এরূপ হয় যে, পৃথিবী দ্বারা সূর্য্যমণ্ডলের কিয়দংশ কিয়ৎকালের জন্য চন্দ্র হইতে অন্তরালে পতিত হয়। যখন এরূপ হয়, তখন ঐ অংশে সূর্য্যকিরণ পতিত হইতে পারে না বলিয়া তাহা আর আলোকিত হইতে পারে না। তখনই চন্দ্রগ্রহণ হইয়া থাকে। সকলেই লক্ষ্য করিবেন যে যখন চন্দ্রের কিয়দংশে গ্রহণ হয়, তখন ঐ অংশ একেবারে অদৃশ্য হইয়া যায় না, কেবল অস্পষ্ট ও আঁধার ভাবে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। সপ্তমী অষ্টমী প্রভৃতি তিথিতে যখন চন্দ্রের কিয়দংশ আলোকিত হয়, তখনও চন্দ্রের সম্পূর্ণাবয়ব দেখা গিয়া থাকে। আলোকিত পরিশূন্য অংশ তখন চন্দ্রের স্বকীয় দেহদ্বারা সূর্য্য হইতে অন্তরালে অবস্থিতি করে। এবং গ্রহণের সময় আলোক পরিশূন্য অংশ পৃথিবীর দেহদ্বারা সংঘটিত হয়। উভয়ের এই মাত্র

প্রভেদ। পৃথিবী সৰ্ব্বদাই আবৰ্ত্তন পূৰ্ব্বক স্বকীয় পথে অগ্রসর হইতেছে বলিয়া তদ্দ্বারা যে গ্রহণ সংঘটিত হয়, তাহা স্বল্পক্ষণমাত্র স্থায়ী হইয়া থাকে। চন্দ্রগ্রহণ কখন কখন চন্দ্রের কিয়দংশে সংঘটিত হয়, কখনও বা উহার সমগ্রাবয়বেও ঘটিয়া থাকে। শেষোক্ত স্থলে লোকে পূর্ণগ্রাস কহিয়া থাকে।

চন্দ্র-গ্রহণ।
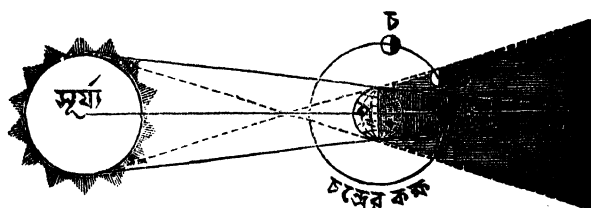
এখন দেখ পৃথিবীদ্বারা চন্দ্রের যে অংশটুকু সূর্য্য হইতে আড়ালে পড়িয়াছে, তথায় গ্রহণ হইয়াছে; তাহা কৃষ্ণবর্ণ চিহ্নে চিহ্নিত হইয়াছে। আর যে অংশে সূর্য্যকিরণ পতিত হইতেছে তথায় গ্রহণ হয় নাই, তাহা সাদা চিহ্নে চিহ্নিত রহিয়াছে। চন্দ্র গ্রহণ যে প্রতি পূর্ণিমাতেই হইবে তাহা নহে, তবে পূর্ণিমা ভিন্ন অন্য তিথিতে হইতে পারে না। যে হেতু পূর্ণিমা ও অমাবস্যা ভিন্ন অপর তিথিতে সূর্য্য, পৃথিবী ও চন্দ্র পরস্পর সমসূত্রপাত ন্যায়ে অবস্থিত করে না, সুতরাং আড়াল পড়িবার সম্ভাবনা নাই। অমাবস্যা তিথিতে মূলে চন্দ্রকে দেখিতেই পাওয়া যায় না, কারণ তখন চন্দ্র সূর্য্যমণ্ডলকে স্বীয় পৃষ্ঠভাগে রক্ষা করে। সুতরাং চন্দ্র সূর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে অস্তগমন করিয়া থাকে; এইজন্য পৃথিবীর লোক সূর্য্যতেজে চন্দ্রের অবস্থিতি দৃষ্টি করিতে পারে না।

সূর্য্য-গ্রহণ।

এক্ষণে সূর্য্যগ্রহণ কিরূপে হয় তাহা বিবৃত হইতেছে। এইমাত্র কথিত হইল যে অমাবস্যার সময়ও চন্দ্র, সূর্য্য ও পৃথিবী পরস্পর সম-সূত্রপাত-ন্যায়ে অবস্থিতি করে বটে, কিন্তু, চন্দ্র সূর্য্যকে স্বীয় পৃষ্ঠভাগে রক্ষা করে। তখন সূর্য্যের নিম্নে চন্দ্র ও তন্নিম্নে পৃথিবী অবস্থান করিতে থাকে। এই কারণে তখন দিনের বেলায় চন্দ্র সূর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে থাকে বলিয়া সূর্য্যতেজে চন্দ্রের অস্তিত্ব দিবসে নয়নগোচর হয় না। আর সূর্য্য অস্তগমন করিলেই চন্দ্র অস্তগমন করিল, কাজেই রাত্রিতেও উহাকে আর দেখিবার যো নাই। অমাবস্যার সময় চন্দ্রের উপর পৃষ্ঠে অর্থাৎ সূর্য্য ও চন্দ্রের মধ্যস্থলে পৃথিবীবৎ কোন ভুবন যদি থাকে, তাহা হইলে তাহার লোক ঐ সময়ে পূর্ণিমা সন্দর্শন করিয়া থাকে। এক্ষণে দেখ, অমাবস্যার সময় চন্দ্র যখন সূর্য্যমণ্ডলের নীচে অবস্থিতি করে, তখন কদাচিৎ এরূপ হয় যে, পৃথিবীস্থ স্থান বিশেষ চন্দ্রদ্বারা সূর্য্য হইতে অন্তরালে পতিত হয়। তখন সূর্য্যালোক চন্দ্রা-বয়বদ্বারা বাধা পাওয়াতে পৃথিবীস্থ লোকে দেখে যে সূর্য্যের কিয়দংশ যেন
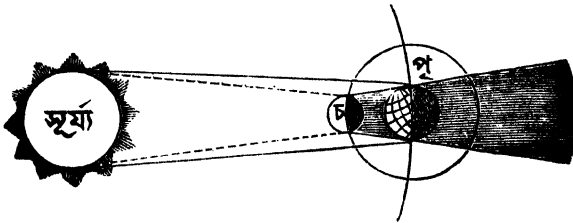
ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাকেই সূর্য্যগ্রহণ কহে। সূর্য্যগ্রহণের সময় সূর্য্যের যে ক্ষয়প্রাপ্ত অংশ তাহা আর কিছুই নয়, তাহা সেই চন্দ্রমণ্ডল, যাহাকে অমাবস্যার সময় লোকে দেখিতে পায় না, ইহা সেই পদার্থ। মেঘে যেমন সূর্য্যকে ঢাকে, চন্দ্রও সেইরূপ সূর্য্যকে ঢাকে,

তাহাই লোকে সূর্য্যগ্রহণ কহিয়া থাকে। সূর্য্যগ্রহণও কখন কিয়দংশ ও কখন সম্পূর্ণ হইয়া থাকে। স্বল্পদূর বিস্তৃত মেঘ যেমন আমাদের সমীপবর্ত্তী বলিয়া অতবড় সূর্য্যকে আচ্ছাদন করিতে পারে, ক্ষুদ্রাবয়ব চন্দ্রও তদ্রূপ সূর্য্যকে আচ্ছাদন করে। অথবা সূর্য্যকে আচ্ছাদন করে না, বলিয়া আমাদের চক্ষুকে আচ্ছাদন করে, ইহাই বলা উচিত; কারণ আমাদের চক্ষু আচ্ছাদিত হইলেই জগতের সকল বস্তুই আচ্ছাদিত হইয়া থাকে। চন্দ্রগ্রহণ যেমন সকল পূর্ণিমাতে হয় না, কিন্তু পূর্ণিমা ভিন্ন অন্য তিথিতে হইতে পারে না, সেইরূপ সূর্য্য গ্রহণও সকল অমাবস্যায় হয় না, কিন্তু অমাবস্যা ভিন্ন অন্য তিথিতে হইতে পারে না।

শীত ও গ্রীষ্ম।

সকলেই অনুভব করিবেন যে শীত বলিয়া স্বতন্ত্র কোন বস্তু নাই, তাপের অভাবই শীত। যেমন অন্ধকার বলিয়া কোন পদার্থই নাই, আলোকের অভাবই অন্ধকার, শীতও তাই। জগতের সকল বস্তুতেই অল্প বা অধিক তাপ বিদ্যমান আছে। এমন যে বরফ, ইহাতেও কিছু তাপ আছে, তাহার প্রমাণ, দুইখানি বরফ লইয়া ঘর্ষণ করিলে তাপ উদ্ভূত হইয়া উহা দ্রবীভূত করে। কোন বস্তুকে উত্তপ্ত করিবার আবশ্যকতা হইলে যেমন তাহাতে তাপ সংযুক্ত করিতে হয়, কোন বস্তুকে শীতল করিতে হইলে, সেইরূপ তাহা হইতে তাপ বিযুক্ত করিতে হয়। জলে তাপ সংযুক্ত হইলে ক্রমে ফুটিতে থাকে ও বাষ্পাকার ধারণ করে এবং জল হইতে তাপ বিযুক্ত হইলে বরফরূপে জমাট বাঁধিয়া যায়। সকল দ্রব্যই তাপ পাইলে বিস্তৃত হয় ও শীতে সঙ্কুচিত হয়, কিন্তু জলে শীত পাইলে যখন তুষাররূপে পরিণত হয় তখন তাহার বিস্তার আরও বর্দ্ধিত হয়। কেবল জলেই এই প্রকার ব্যভিচার দৃষ্ট হয়, অপর বস্তুতে তাহা দৃষ্ট হয় না।

সকল বস্তুতে সম পরিমাণ তাপ থাকিতে পারে না। জলে যতটুকু তাপ থাকিতে পারে, তাহার অতিরিক্ত তাপ পাইলেই বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়। অপরাপর বস্তু সম্বন্ধেও ঐ নিয়ম; কেবল যে সমস্ত বস্তু তাপে দগ্ধ হইয়া যায়, তাহা দগ্ধ হইবার কালে স্বল্প ও বহুল সকল প্রকার তাপ পাইতে পারে। যতটুকু তাপ পাইলে জল বাষ্প হয়, ততটুকু তাপে রৌপ্য গলিবে না, আবার যতটুকু তাপে রৌপ্য গলিয়া যায়, ততটুকু তাপে স্বর্ণ গলে না, তাহা অপেক্ষা অধিক তাপের প্রয়োজন; আবার লৌহ গলিতে আরও অধিক তাপ আবশ্যক। এইরূপে দেখা যায় যে তাপের আধিক্য বা স্বল্পতার সীমা নাই। এপর্য্যন্ত, একেবারে তাপ নাই, এমন বস্তু আবিষ্কৃত হয় নাই এবং তাপের চরম বৃদ্ধি কতদূর তাহাও নির্ণীত হয় নাই। তাপমান বা থার্ম্মোমিটার নামে যে যন্ত্র আছে তাহা প্রায় সকলেই দেখিয়াছেন। তাহাতে যে ডিগ্রী বা পরিমাণ প্রদত্ত হইয়াছে তদ্দারা কোন্ বস্তু কত উত্তপ্ত তাহা অবগত হওয়া যায়। সচরাচর তাপমান যন্ত্রে শূন্য হইতে আরম্ভ করিয়া ২১২ ডিগ্রী চিহ্ন প্রদত্ত হয়। জ্বর পরীক্ষার জন্য যে তাপমান যন্ত্র ব্যবহৃত হয় তাহাতে ১১০ ডিগ্রীর অধিক চিহ্ন নাই; কারণ জ্বর পরীক্ষায় উহা অপেক্ষা অধিক ডিগ্রী জানিবার আবশ্যকতা নাই। সুস্থ অবস্থায় মনুষ্যের রক্ত যত উত্তপ্ত, তাহাতে তাপমান যন্ত্রের পারদ ৯৮·৩ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠিয়া থাকে; উহার অধিক উঠিলেই জ্বর হইয়াছে বলিয়া বুঝা যায়। ১০৩ ডিগ্রী পর্য্যন্ত জ্বর মধ্যম, উহার অধিক হইলেই প্রবল জ্বর বুঝিতে হইবে।

লোকে গৃহ-ভিত্তিমধ্যে যে তাপমান যন্ত্র রাখিয়া থাকে, তাহাতে শূন্য হইতে ২১২ ডিগ্রী চিহ্ন থাকে। জল যত উত্তাপ পাইলে ফুটিতে থাকে, তত উত্তাপ তাপমান যন্ত্রের গাত্রে লাগিলে উহার পারদ ২১২ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠিয়া থাকে। আর যতদূর শীতলতায় জল কঠিন

হইয়া বরফ হইতে আরম্ভ হয়, ততদূর শীতলতা উক্ত তাপমান যন্ত্রে লাগিলে উহার পারদ ৩২ ডিগ্রী চিহ্নে নামিয়া আইসে। এই তাপমান যন্ত্র ফার্হেন্‌হাইট্‌ নামক এক বিজ্ঞানবিদ্‌ পণ্ডিত প্রথম প্রস্তুত করেন এইজন্য ইহাকে "ফার্হেন্‌হাইট্‌ থার্ম্মোমিটার" কহে। ইহাতে যে শূন্য হইতে ২১২ ডিগ্রী চিহ্ন দেওয়া আছে, তাহাতে এমন বোধ হয় যে বরফে যতটুকু তাপ আছে তাহার ৩২ ডিগ্রী নিম্নে আর তাপ নাই। ফার্হেন্‌হাইট্‌ বোধ হয়, উহার নিম্নে আর তাপের সত্তা অনুভব করিতে পারেন নাই; কিন্তু এক্ষণে বিজ্ঞান বলে নির্ণয় হইয়াছে যে উহার বহুগুণ নিম্নেও তাপের সত্তা বিদ্যমান আছে। অতএব এরূপ তাপ-মান যন্ত্রের শূন্য ডিগ্রী বলিলে এইমাত্র বুঝিতে হইবে যে বরফ হইতে ৩৩ ডিগ্রী তাপ কম, এইমাত্র—একেবারে তাপের অভাব নহে। অপর এক বৈজ্ঞানিক তাপমান যন্ত্র আছে, তাহাতে জলের স্ফুটন তাপ ১০০ ডিগ্রী দ্বারা চিহ্নিত থাকে। উহাকে "সেন্টিগ্রেড্‌ থার্ম্মো-মিটার" কহে। অধিকতর তাপ পরিমাণ করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন বৈজ্ঞানিক তাপমান যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে; তাহাতে মনুষ্যবুদ্ধির আশ্চর্য্য ক্ষমতা প্রকাশ পাইতেছে।

এক্ষণে কথা হইতেছে যে তাপের স্বল্পতাতেই শীতের বৃদ্ধি এবং তাপের আধিক্যেই গ্রীষ্মের বৃদ্ধি। যে বস্তু হইতে তাপ বিযুক্ত হয় তাহাই শীতল হয়। অনেকে কলিকাতায় কুল্পি বরফ দেখিয়াছেন, উহা কি প্রকারে প্রস্তুত হয় তাহা দেখ। একটা হাঁড়িতে বরফখণ্ড সমূহ সংস্থাপন পূর্ব্বক তাহাতে লবণ দিতে হয়। আড়াই সের বরফে পাঁচ পুয়া লবণ হইলে অতি উত্তম হয়। তৎপরে ধাতুনির্ম্মিত শৃঙ্গবৎ পাত্র সমূহের মধ্যে শর্করা মিশ্রিত দুগ্ধ, নারিকেলোদক, প্রভৃতি জলীয় তরল পদার্থ স্থাপন পূর্ব্বক উহার মুখ বন্ধ করিতে হয় এবং উক্ত হাঁড়ির মধ্যে ঐ সমস্ত সংস্থাপন করিতে হয়। এক্ষণে বরফে লবণ সংযুক্ত

হওয়ায় উক্ত শৃঙ্গবৎ পাত্র সমূহের ভিতর হইতে তাপ টানিয়া বাহির করে এবং সেই তাপে বরফ নিজে গলিয়া যায়। ভিতরের পদার্থ তাপের স্বল্পতা হেতু জমিয়া যায়; উহাই কুল্পি বরফ। কৃত্রিম উপায়ে কলে যে বরফ প্রস্তুত হইতেছে তাহাও জল হইতে কৌশল পূর্ব্বক তাপ আকর্ষণ করতঃ সম্পন্ন হইয়া থাকে। যে পাত্রে জল থাকে তাহার বহির্ভাগে ইথার নামক তরল ঔষধ বিশেষ কৌশলপূর্ব্বক স্থাপনপূর্ব্বক তাহাতে উত্তাপ দিলে ঐ ইথার মধ্যস্থিত জলের উত্তাপ লইয়া উড়িয়া যায়, ইহাতেই বরফ প্রস্তুত হয়।

এক্ষণে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে তাপই পদার্থ বিশেষ বটে, তাহার স্বল্পতাতেই শীত। আমাদের দেশে সূর্য্যের তাপ অধিক লাগে বলিয়া এস্থানে গ্রীষ্ম অধিক আর মেরুপ্রদেশে সূর্য্যের তাপ তির্য্যক্ ভাবে পতিত হয় বলিয়া তথায় তাপ স্বল্প, এই জন্য তথায় ঘোর শীত। আবার আফ্রিকায় সাহারা প্রভৃতি স্থানে সূর্য্যের তাপ আরও সরল ভাবে পতিত হয়, এইজন্য তথায় আমাদের দেশ অপেক্ষাও অধিক গ্রীষ্ম। পৃথিবীর মধ্যস্থল হইতে যত উত্তরে বা দক্ষিণে যাওয়া যাইবে, ততই শীতের আধিক্য অনুভূত হইবে। শীত গ্রীষ্মের এই প্রথম কারণ।

আমাদের দেশে ডিসেম্বর ও জানুয়ারি মাসে প্রবল শীত এবং এপ্রেল ও জুন মাসে প্রবল গ্রীষ্ম হইবার কারণ সন্নিবেশিত হইতেছে। আমাদের দেশে যখন দিন বড় ও রাত্রি ছোট হইতে আরম্ভ হয় তখন দিনে সূর্য্যতাপে পৃথিবী যতদূর উত্তপ্ত হয় রাত্রিতে তত শীতল হয় না; এই কারণে ক্রমে ক্রমে পৃথিবী উত্তপ্ত হওয়ায় গ্রীষ্মের আধিক্য হইয়া থাকে। তাহার উপর আবার সে সময় সূর্য্য মস্তকোপরি থাকিয়া আরও সরলভাবে তাপ বিতরণ করে। এই কারণে তখন বিষুব-রেখার উত্তরভাগে অর্থাৎ আমাদের দেশে গ্রীষ্মকাল আসিয়া থাকে।

কিন্তু সে সময় আবার বিষুব রেখার দক্ষিণ ভাগে শীতের প্রকোপ হইয়া থাকে; কারণ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে বিষুব রেখার উত্তরে যখন দিন বড়, বিষুব রেখার দক্ষিণে তখন দিন ছোট; আর সূর্য্যের উত্তরায়ণ গতিতে আমাদের এখানে সূর্য্যতেজ সরলভাবে পতিত হয়, কিন্তু বিষুব-রেখার দক্ষিণে তির্য্যক্‌ভাবে পতিত হয়। আর যখন সূর্য্যের দক্ষিণায়ন গতি হয় তখন আমাদের দেশে দিন ছোট ও রাত্রি বড় হইতে থাকে, ইহাতে এই ফল হয় যে পৃথিবী দিনে যত উত্তপ্ত হয়, রাত্রিতে তাহার অধিক শীতল হইতে থাকে। ইহাতে ক্রমশঃ শীতের আধিক্য হয়; তাহার উপর সূর্য্যকিরণও সে সময়ে তির্য্যক্‌ভাবে পতিত হয়। বিষুব-রেখার দক্ষিণে পূর্ব্বোক্ত কারণে তখন গ্রীষ্ম হইতে থাকে। তথায় তখন দিন বড় ও রাত্রি ছোট হয় এবং সূর্য্যতেজ সরলভাবে পতিত হয়। শীত গ্রীষ্মের এই দ্বিতীয় কারণ।

সূর্য্যতাপে ভূমি যত শীঘ্র উত্তপ্ত হয় জল তত শীঘ্র উত্তপ্ত হয় না; এইজন্য সমুদ্র সন্নিহিত স্থানে তত অধিক গ্রীষ্ম হয় না। আবার জল উত্তপ্ত হইলে জুড়াইতে যত সময় লাগে ভূমি উত্তপ্ত হইলে তাহা জুড়াইতে তদপেক্ষা অল্প সময় লাগে। এইজন্য শীতকালে সমুদ্র সন্নিহিত স্থান অপেক্ষা দূরবর্ত্তী স্থানে অধিক শীত হয়। এই কারণে বঙ্গদেশ অপেক্ষা উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে শীত ও গ্রীষ্ম উভয়ই অধিক। শীত গ্রীষ্মের এই তৃতীয় কারণ। তদ্ভিন্ন, সূর্য্যতাপে ভূমি যত উত্তপ্ত হয় বায়ু তত উত্তপ্ত হয় না; এইজন্য ঊর্দ্ধভাগে যতই আরোহণ করিবে ততই শীতল অধিক হইবে। এইজন্য উচ্চ পর্ব্বত চূড়া চির তুষারে আচ্ছন্ন। এইজন্যই দার্জিলিং সিমূলা প্রভৃতিতে অত্যন্ত শীত। শীত গ্রীষ্মের এই চতুর্থ কারণ।

বায়ু ও তাহার আশ্চর্য্য ক্রিয়া।

আমরা সর্ব্বদাই বায়ুর সত্তা অনুভব করি; যখন আকাশমণ্ডল স্থির, এমন কি বৃক্ষের পত্রটী পর্য্যন্ত সঞ্চালিত হয় না, তখনও বায়ুর অস্তিত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাকি। কারণ, আমরা সর্ব্বদাই নিশ্বাসরূপে বায়ু গ্রহণ করিয়া থাকি; নিশ্বাস বন্ধ হইলে কত অল্প সময়ের মধ্যে জীবের মৃত্যু হইয়া থাকে—তাহা বিবেচনা কর। এই বায়ু রাশীকৃত ভাবে পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া আছে। ভূপৃষ্ঠে বায়ুর অভাব আছে এমন স্থান নাই। পৃথিবীর সমীপে বায়ুর সত্তা অনায়াসেই অনুভব করা যায়, কিন্তু পৃথিবী হইতে ক্রমশঃ ঊর্দ্ধভাগে বায়ুর সত্তা ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া থাকে; ক্রমে বহুল ঊর্দ্ধভাগে আর বায়ুর অবস্থিতি অনুভব হয় না। এই কারণে অত্যুচ্চ পর্ব্বত চূড়ায় আরোহণ করিলে অথবা বেলুন-যন্ত্র দ্বারা বহুদূর ঊর্দ্ধে উত্থিত হইলে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ক্লেশ অনুভূত হইয়া থাকে।

বায়ু যে ভারহীন পদার্থ তাহা নহে, ইহারও বিলক্ষণ ভার আছে। এই সমগ্র বায়ুমণ্ডল পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া পৃথিবীতে সংলগ্ন রহিয়াছে। বায়ুমণ্ডল পৃথিবীর উপর কতদূর ভর দিয়া অবস্থিতি করিতেছে তাহা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। সমগ্র পৃথিবীর উপর ২৯.৯৪ ইঞ্চি গভীর পারদ পরিব্যাপ্ত হইলে, সেই পারদের যত ভার সমগ্র বায়ুমণ্ডলের ততদূর ভার জানিবে। ইহাতে গণনা দ্বারা স্থির করা যায় যে দেড় পরার্দ্ধমণ বায়ু-ভার পৃথিবী বহন করিয়া থাকে। কিন্তু ভূপৃষ্ঠের বায়ুভার সর্ব্বত্র একরূপ নয়; সমুদ্রোপরি যত অধিক উচ্চ ভূমিতে ও পর্ব্বতোপরি তাহা অপেক্ষা অনেক কম।

বায়ু যে নিতান্ত স্বচ্ছ পদার্থ তাহা নহে। দুইটী প্রধান বাষ্প বা গ্যাস্ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় স্বতই মিশ্রিত হইয়া বায়ু নামক

পদার্থের উৎপত্তি হইয়াছে। অক্সিজন্ বা অম্লজান বাষ্প ২১ ভাগ এবং নাইট্রোজন্ বা যবক্ষার জান বাষ্প ৭৯ ভাগ বায়ুর প্রধান উপাদান। তদ্ভিন্ন কিছু কার্বনিক বা অঙ্গারক বাষ্প এবং নানাবিধ পরিমাণ জলীয় বাষ্প উহার সহিত মিশ্রিত থাকে। এই সকল কারণে বায়ু যেরূপ স্বচ্ছ অনুভূত হয় তদ্রূপ নহে এইজন্য সূর্য্যকিরণ বায়ু মধ্য দিয়া পৃথিবীতে আসিতে ইহার পাঁচ ভাগের এক ভাগ তেজ বিনষ্ট হইয়া যায়। বায়ু যদি সম্পূর্ণ স্বচ্ছ হইত তাহা হইলে সূর্য্য কিরণ আরও প্রখরভাবে ভূমিতলে পতিত হইত।

বায়ুর প্রবাহ।

নানা কারণে বায়ুমণ্ডল বিচলিত হয়, তখন সেই প্রবহমান বায়ু আমরা স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করিয়া থাকি। ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ভিন্ন প্রকার বায়ুর ভার এবং সূর্য্যোত্তাপ বায়ু বহনের সর্ব্বপ্রধান হেতু। যে স্থলে বায়ুর ভার অল্প সেইস্থানে, অধিকতর বায়ুভার বিশিষ্ট স্থান হইতে বায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে। এইজন্য সমুদ্র বা হ্রদ হইতে উচ্চভূমিতে বায়ু প্রবাহিত হয়। সমুদ্র হইতে ভূমির দিকে বায়ুর গতি হইবার অপর কারণও আছে। সূর্য্যতাপে ভূমি যত শীঘ্র উত্তপ্ত হয় জল তত শীঘ্র উত্তপ্ত হয় না। যখন ভূমি উত্তপ্ত হয় তখন তদুপরিস্থ বায়ু তাপ সংযোগে লঘু ও বিস্তৃত হওয়াতে ঊর্দ্ধদেশের অপেক্ষাকৃত শীতল বায়ু ভেদ করিয়া উত্থিত হয়। যেমন শোলা জল অপেক্ষা লঘু বলিয়া জলে ভাসিয়া উঠে সেইরূপ লঘু বায়ু ঘন বায়ু ভেদ করিয়া উত্থিত হয়। তখন ঐ বায়ুর স্থানাধিকার করিবার জন্য অপেক্ষাকৃত শীতল বায়ু সমুদ্র হইতে বহিতে থাকে। এইজন্য গ্রীষ্ম-কালে প্রবল রৌদ্রের পর অপরাহ্ণে প্রবল দক্ষিণ বায়ু আমরা অনুভব করিতে পারি। আবার যখন রাত্রিকালে ভূমি শীতল হইতে আরম্ভ

হয় তখন তদুপরিস্থ বায়ু শীতল হওয়ায় আর উর্দ্ধদেশে উঠিতে পারে না, তখন ক্রমে বায়ু প্রবাহ কমিতে আরম্ভ করে।

"মন্সূন্ বা আর্ত্তব বায়ু প্রবাহিত হইবার কারণও সূর্য্য-কিরণ। আমরা দেখি বৎসরের মধ্যে কএক মাস উত্তর দিক্ হইতে বায়ু প্রবাহিত হয় এবং অবশিষ্ট মাস দক্ষিণ দিক্ হইতে বহিতে থাকে। এতদ্দেশে দক্ষিণ দিক্ হইতে বায়ু প্রবাহিত হইবার তিনটী কারণ। প্রথম দুইটী বর্ণিত হইয়াছে; অর্থাৎ সমুদ্র অপেক্ষা উচ্চভূমিতে বায়ুর ভার অল্প বলিয়া সমুদ্র হইতে স্থলমধ্যে বায়ু প্রবাহিত হয়, এবং ভূমিস্থ বায়ু সমুদ্রস্থ বায়ু অপেক্ষা অধিক উত্তপ্ত ও লঘু হওয়াতে সমুদ্র বায়ু স্থলোপরি সঞ্চালিত হয়। আমাদের বঙ্গদেশের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, তজ্জন্য তথা হইতে দেশ মধ্যে বায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে। তৃতীয় কারণ সূর্য্যের উত্তরায়ণ গতি; সূর্য্য বিষুব রেখার উত্তরাংশে যখন অবস্থিতি করে, তখন তাহার তাপ উক্তস্থানে সরলভাবে পতিত হওয়ায় তথাকার বায়ু বিষুব-রেখার দক্ষিণস্থ বায়ু অপেক্ষা লঘু হয়, সুতরাং উপরে উত্থিত হয়; তখন দক্ষিণ গোলার্দ্ধ হইতে বায়ু উত্তর গোলার্দ্ধের দিকে বহিতে থাকে। এই বায়ু গতিকে দক্ষিণ-পূর্ব্ব মন্সূন্ বা দক্ষিণাবর্ত্ত বায়ু কহিয়া থাকে। উক্ত ত্রিবিধ কারণে যে দক্ষিণ বায়ু প্রবাহিত হয়, শীতাগমে উহার দুইটী কারণ উপস্থিত থাকে না; এই কারণে তখন দক্ষিণ বায়ু না বহিয়া উত্তর বায়ু প্রবাহিত হয়। যে দুইটী কারণ উপস্থিত থাকে না তাহা বিবৃত হইতেছে। যখন বিষুব রেখার দক্ষিণ ভাগে সূর্য্য অবস্থিতি করে অর্থাৎ যখন সূর্য্যের দক্ষিণায়ণ গতি হয়, তখন সেই অংশের বায়ু সূর্য্যতাপে লঘূকৃত হইয়া উর্দ্ধদেশে ধাবিত হয়, সুতরাং তখন উত্তর গোলার্দ্ধ হইতে বায়ু দক্ষিণ গোলার্দ্ধে প্রবাহিত হয়। উত্তর বায়ু বা উত্তর পশ্চিম মন্সূন্ হইবার ইহাই কারণ। আবার, শীতকালে ভূমি যত শীঘ্র শীতল হয়, জল

তত শীঘ্র শীতল হয়না ; এইজন্য শীতকালে সমুদ্রস্থ বায়ু ভূমিস্থ বায়ু অপেক্ষা লঘু হওয়াতে ভূমি হইতেই সমুদ্রভাগে বায়ু প্রবাহিত হয়। ইহাতেও উত্তর বায়ু আমরা অনুভব করিতে পারি।

কেবল অপর কারণটী সর্ব্বদাই বিদ্যমান্ থাকে ; অর্থাৎ সমুদ্রোপরি বায়ুর তাপ অধিক বলিয়া অপেক্ষাকৃত স্বল্প ভারবিশিষ্ট ভূমিতে তাহা প্রবাহিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই একটীমাত্র কারণকে উপরোক্ত দুইটী কারণ অবশ্যই পরাজিত করিতে পারে ; তাই কার্ত্তিক মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত চারিমাস আমরা উত্তর-বায়ু প্রাপ্ত হই। কিন্তু উত্তর বায়ু বহিবার বিপরীত কারণটী সর্ব্বদা বাধা প্রদান করায় উপরোক্ত দুইটী কারণ সত্বরই ধ্বংস পাইয়া থাকে, তাই বৎসরের মধ্যে আট মাস দক্ষিণ বায়ু বহিয়া থাকে।

ঝটিকা।

বায়ু নানা কারণে সময়ে-সময়ে প্রবলবেগে প্রবাহিত হয় ; তখন বায়ুর গতি শ্রবণ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। যদি বায়ু প্রতি সেকেণ্ডে ৩০ গজ গমন করে তখনই প্রবল বায়ু কহা গিয়া থাকে কিন্তু ঝটিকার সময় কখন কখন বায়ুর গতি প্রতি ঘণ্টায় ৭০।৮০ মাইল পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছে। তখন কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার সংঘটিত হয় তাহা অনুমান কর। স্বল্পকাল মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ ও অট্টালিকা সমূহ ভূমিসাৎ হইয়া পড়ে। এক একবার যে ঝটিকা বা প্রবাহ উপস্থিত হয় তাহাতে সুবৃহৎ অশ্বথ ও আম্রাদি তরু এত সত্বর ও সহজে মূল সমেত উৎপাটিত হয় যে, বোধ হয় যেন বালকেরা ক্রীড়াচ্ছলে ছত্রাক সমূহ (বেঙের ছাতা) উৎপাটন করিতেছে। আমাদের দেশে কএকবার উক্তরূপ ভয়ঙ্কর ঝড় হইয়া গিয়াছে ; তন্মধ্যে সন ১২৭১ সালের আশ্বিন মাসে যে ঝটিকা হয়, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর। ঐ দিন প্রাতঃকাল হইতে

ঝটিকা আরম্ভ হইয়া সমস্ত দিন অবস্থিতি করে। ঐ ঝড়ে কত লোকের ধন ও প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কএক বৎসর গত হইল চট্টগ্রাম প্রদেশে ভয়ঙ্কর ঝড় হওয়াতে বহুসংখ্যক মনুষ্য জীবন হারাইয়াছে। ঝটিকার সময় বায়ুর বেগ এতই প্রবল হয় যে, বড় বড় জাহাজের স্থূল লোহ শৃঙ্খল সমূহ পরস্পর ঘর্ষণে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, এবং জাহাজ নিরালম্ব হইয়া যথেচ্ছভাবে বিতাড়িত ও বিনষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপ ঝটিকাকে ইংরাজীতে সাইক্লোন কহিয়া থাকে, কারণ সেই সময় বায়ু প্রবাহ ঘড়ির কাঁটার মত চতুর্দ্দিক্ ঘুরিয়া আইসে। "সাইক্লোন্" অর্থ প্রদাক্ষিণ গমন। অপর "টর্ণেডো" নামে এক প্রকার ঝটিকা আছে তাহাও অতীব ভয়ঙ্কর। যেন একটা বৃহৎ বায়ুস্তম্ভ অতিবেগে প্রধাবিত হইয়া স্বীয় পথস্থিত সমস্ত পদার্থকে সম্মার্জ্জনা পরিশোধনবৎ অপসারিত, বিঘূর্ণিত বিচূর্ণ করিয়া থাকে। টর্ণেডোর ক্রিয়া যেন ভৌতিক ক্রিয়ার মত বোধ হয়। হঠাৎ আসিয়া দেশের এক স্থান দিয়া নিমেষ মধ্যে চলিয়া যায়। ইহাতে নিমেষ মধ্যে উহার পথস্থিত বৃক্ষ ও অট্টালিকাদি স্থানচ্যুত হইয়া নানা স্থানে গিয়া উপস্থিত হয়; গো, মনুষ্যাদিও বায়ুর সহিত উড়িয়া কোথায় গিয়া পতিত হয় তাহার ঠিকানা থাকে না। বৃহৎ বৃক্ষাদি সমূল উৎপাটিত হইয়া বহুদূরে গমনপূর্ব্বক হয়তো লম্বভাবে অপর বৃক্ষাদিকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করে। অনেকে গরু প্রভৃতির উড্ডয়ন অসম্ভব মনে করিতে পারেন, কিন্তু যাঁহারা ঢাকার বিগত টর্ণেডো ঝটিকার ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে ভগবানের বিশ্বরাজ্যে উহাও সম্ভবপর। আর, আমাদের দেশে অজ্ঞ লোকেরা যে ডাকিনীর "গাছ-চালার" কথা কহিয়া থাকে তাহারও মূলে সত্য আছে ইহা বুঝিতে হইবে। তাহারা কহে ডাকিনীগণ মন্ত্রবলে এক স্থান হইতে বৃহৎ বৃক্ষ চালিয়া লইয়া অপর বহু দূরতর স্থানে সংস্থাপিত

করে। বোধ হয় টর্ণেডোর ক্রিয়ায় লোকে সহসা কোন বৃহৎ বৃক্ষকে স্থানচ্যুত হইতে এবং অবৃক্ষ স্থানে বৃহৎ বৃক্ষ সহসা উপস্থিত হইতে দেখিয়া উক্তরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকিবে। টর্ণেডোর গতি অপ্রশস্ত স্থানের মধ্য দিয়াই হইয়া থাকে, এই কারণে তাহার দুই পার্শ্বে কোনরূপ ক্ষতি দৃষ্ট হয় না।

জলস্তম্ভ।

পূর্ব্বোক্ত টর্ণেডো ঘূর্ণিবায়ুর ক্রিয়া। যখন নানাদিক্ হইতে বায়ু প্রবাহ আসিয়া উপস্থিত হয় তখন উহারা পরস্পর আহত হইয়া গমন-পথাভাবে ঊর্দ্ধদিকে উত্থিত হয়; এই সময় বায়ু অতি প্রবলবেগে ঘূর্ণিত হইতে থাকে এবং স্তম্ভবৎ ঊর্দ্ধগামী হয়। ক্রমে এই বায়ুস্তম্ভ প্রবলবেগে একদিকে ধাবিত হইতে থাকে; ইহাতেই পূর্ব্বোক্ত দুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়া থাকে। আমরা কখন কখন ঘূর্ণমান বায়ুর ক্রিয়া সামান্যভাবে দেখিতে পাই; কখন কখন এরূপ দেখা যায় যে ভূমিস্থ ধূলি ও শুষ্ক পত্রাদি ঘুরিতে ঘুরিতে ঊর্দ্ধ্বভাগে বহুদূর উত্থিত হয়। সমুদ্রেও কখন কখন হ্রদ এবং নদীতেও ঘূর্ণমান বায়ুদ্বারা আশ্চর্য্য দৃশ্য সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। কখন এরূপ ঘটিয়া থাকে যে ঘূর্ণমান প্রবল বায়ু সমুদ্রোপরিস্থ মেঘমণ্ডলে লাগিয়া ক্রমশঃ অবতীর্ণ হইতে থাকে। ইহাতে বোধ হয় যেন মেঘের কিয়দংশ হস্তিশুণ্ডের ন্যায় নামিয়া আইসে; সেই সময় অবতীর্ণ ঘূর্ণমান বায়ুর বেগে সমুদ্রজলেরও কিয়দংশ স্তম্ভবৎ উত্থিত হয় ও পূর্ব্বোক্ত অবতরণশীল মেঘের সহিত সংযুক্ত হয়। ইহাতে বোধ হয় যেন মেঘমালারূপ ছাদ হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত স্তম্ভ সংগঠিত হইয়াছে। এইদৃশ্য অতি চমৎকার, কিন্তু উহার মূলভাগে বায়ু ভয়ঙ্কর বেগে ঘুরিতে থাকে, এইজন্য সমুদ্রগামী জাহাজের পক্ষে অত্যন্ত বিপদজনক হইয়া থাকে। এই জলস্তম্ভ এক

সময় অনেকগুলি সমুৎপন্ন হইতে পারে এবং উহাদের আকৃতি অবশ্যই ঠিক্ লম্বভাবে না হইয়া বক্রভাবে হেলিয়া ভুলিয়া বায়ুবেগে চলিতে থাকে। ঐ স্তম্ভের মধ্যভাগ শূন্যময়, অতএব উহা যেন চিমনির নলের মত। ঐ সমস্ত জলস্তম্ভ এইরূপে বহুদুর ভ্রমণ পূর্ব্বক ক্রমে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। এক একটা জলস্তম্ভের দৈর্ঘ্যও সামান্য নহে; কথন কথন ছয় সহস্র ফুট্ পর্য্যন্ত উন্নত হইতে দেখা গিয়াছে।
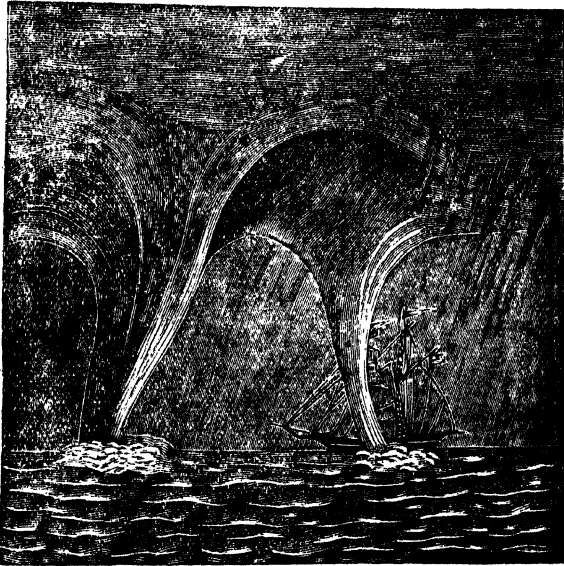
ভারতবর্ষে পৌরাণিক পণ্ডিতগণ কহেন যে ইন্দ্র সমুদ্র-গর্ভোৎপন্ন ঐরাবত নামক হস্তীর উপর আরোহণ পূর্ব্বক বজ্রহস্তে গমনাগমন করেন; তাঁহারা আবার ইন্দ্রকে মেঘবাহনও কহিয়া থাকেন। ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে মেঘসমূহকে হিন্দুগণ হস্তীর সহিত অভেদ কল্পনা

করিয়াছেন। জলস্তম্ভের সময় মেঘমণ্ডলের শুণ্ড্রবৎ অবতীর্য্যমাণ অংশ দেখিয়াই বোধ হয়, তাঁহারা মেঘকে হস্তিবিশেষ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে শুণ্ডদ্বারা উহারা সমুদ্র হইতে জল উত্তোলন করিয়া পৃথিবীতে নিক্ষেপ করে। পুরাণে এরূপ বর্ণনা থাকিলেও পরবর্ত্তী পণ্ডিতগণ কহিয়াছেন, যে সূর্য্য হইতে বৃষ্টি হইয়া থাকে ; সূর্য্য পৃথিবী হইতে যে রস শোষণ করেন তাহা পুনরায় বৃষ্টিরূপে নিক্ষেপ করত বহুল উপকার সাধন করেন। "ইন্দ্র" শব্দের ব্যুৎপত্তিলব্ধ অর্থ যিনি পরম ঐশ্বর্য্যবান্ এবং "ঐরাবত" শব্দের অর্থ সমুদ্রোৎপন্ন ; ইহাতে মেঘ যে সমুদ্রোৎপন্ন বস্তু তাহা হিন্দুরা স্বীকার করিয়াছেন।

আমাদের এতদ্দেশে জলস্তম্ভ অবশ্যই প্রায় কেহ দেখেন নাই। কিন্তু কখন কখন নদীমধ্যে জলস্তম্ভ উৎপন্ন হইয়া থাকে। শুনা যায় এক সময়ে কলিকাতার সমীপবর্ত্তী ভাগীরথীজলে ও ঐ নগরের পূর্ব্ব-দিক্‌স্থিত ধাপানামক হ্রদে এক দিনেই জলস্তম্ভ সমুৎপন্ন হইয়াছিল। লোকে ঐরূপ অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া অবশ্যই মহা বিস্মিত হইয়াছিল।

ঘূর্ণমান বায়ুর ক্রিয়ার আরও অনেক আশ্চর্য্য ঘটনা সংঘটিত হইতে পারে। জলস্তম্ভ উৎপন্ন হইবারকালে জলস্থিত মৎস্যাদিও প্রবল বায়ু-বেগে উর্দ্ধগামী হইয়া স্থানান্তরে পতিত হইতে পারে। ইহাতে লোকে মৎস্যবর্ষণ ও কর্কটবর্ষণ সন্দর্শন করিয়া পরম বিস্মিত হইয়া থাকে। এক সময় ভেক-বর্ষণও হইয়াছিল। ঘূর্ণমান বায়ুর প্রভাবে তৎসহ সকল লঘুবস্তুই উর্দ্ধগামী হইতে পারে, ইহাতে রক্তবৃষ্টি হওয়াও অসম্ভব নয়। এক স্থানে বহুল পরিমাণ বস্ত্র বৃষ্টি হইয়াছিল ; ঘূর্ণমান বায়ুর প্রভাবে এক দূরতর স্থানস্থিত রজকালয় হইতে উক্ত বস্ত্র সমূহ উর্দ্ধগামী হইয়াছিল। তাহারা বস্ত্র সমূহ শুষ্ক করিবার জন্য ভূমিতে বিস্তার করিয়া রাখিয়াছিল, হঠাৎ বায়ু উত্থিত হইয়া দস্যুবৎ বস্ত্রগুলি হরণ করিয়া লইয়াগিয়াছিল।

আন্তরীক্ষ-জল।

মেঘ ও বৃষ্টি।

সূর্য্যকিরণে পৃথিবীস্থিত বারি শুষ্ক ও অদৃশ্য হইতে দেখা যায়, তাহাতে প্রথম বোধ হয় যে জলটা একেবারে নষ্ট হইয়া গেল ; কিন্তু বাস্তবপক্ষে তাহার কণামাত্রও নষ্ট হয় না। তাপ প্রভাবে জল অতি বিস্তৃত হইয়া অতি সূক্ষ্মরূপ ধারণ করতঃ অন্তরীক্ষে গিয়া বায়ুর সহিত মিশ্রিত হয়, তখন উহার সত্তা ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায় না। চক্ষুর অগোচর অতি সূক্ষ্ম উক্ত প্রকার জলকণা সমূহকে জলীয় বাষ্প কহিয়া থাকে। ঐ জলীয় বাষ্প বায়ু সহযোগে বহু উর্দ্ধে উঠিলে তথাকার শীতল বায়ুর সংস্পর্শে সঙ্কুচিত হইতে আরম্ভ হয়। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে নিম্নস্থিত বায়ু অপেক্ষা উপরে যত যাওয়া যায় ততই বায়ু শীতল হইয়া থাকে। এই শীতল বায়ুর সংস্পর্শে জলীয় বাষ্প শীতল ও সঙ্কুচিত হইয়া অতি সূক্ষ্ম জলকণারূপে নয়নগোচর হয়, কিন্তু যতক্ষণ বায়ুর সহিত সমান ভার বিশিষ্ট থাকে ততক্ষণ বায়ুর সহিত বিচলিত হয়। এই প্রকার সূক্ষ্ম জলকণা রাশীকৃত হইয়া যখন বায়ু সহ বিচলিত হইতে থাকে তখন তাহাকেই মেঘ কহে। মহাকবি কালিদাস কহিয়াছেন, "মেঘ—ধূম, জ্যোতিঃ, সলিল, ও মরুতের সন্নিপাত," কিন্তু মেঘে জল ভিন্ন অন্য কোন পদার্থই নাই ; সেই মেঘে তড়িত নামক জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ দেখা যায় বটে, কিন্তু জলেও তড়িত পদার্থ অবস্থিতি করে ; আর বায়ু মেঘের একটা অংশ নয়, কেবল বায়ু দ্বারা মেঘ আকাশে অবস্থিতি করে ও বিচলিত হয়। আর, মেঘে ধূমের কোন সংস্পর্শ নাই ; কাষ্ঠাদি দগ্ধ করিলে যে ধূম উত্থিত হয়,

তাহা আর কিছুই নয় দহ্যমান কাষ্ঠাদিরই অতি সূক্ষ্ম অংশ মাত্র; যদিও তাহার সহিত জলীয় বাষ্প মিশ্রিত থাকিতে পারে বটে, কিন্তু ধূম দ্বারা যে মেঘের শরীর গঠিত হয় তাহা মিথ্যা। তবে ইহা কিছু অসম্ভব নয় যে ধূম বায়ু সহ বহু উর্দ্ধে গমন করিয়া মেঘের সহিত মিশ্রিত হইতে পারে না। মেঘে আরও শীতল বায়ুর প্রবাহ আসিয়া লাগিলে তাহা আরও সঙ্কুচিত হয় ও ক্রমশঃ জল-বিন্দুরূপে পরিণত হইতে থাকে; তখন ভারী হওয়াতে বায়ু আর উহাকে বহন করিতে পারে না; কাজেই তখন পৃথিবীর আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া ভূতলে বৃষ্টি-রূপে পতিত হয়। উহাতে অধিকতর শীতল বায়ু লাগিলে কঠিন বরফ-খণ্ডরূপে পতিত হইতে থাকে, উহাকেই শিলা-বৃষ্টি কহে। অতএব দেখ সূর্য্য পৃথিবী হইতে যে জল আকর্ষণ করেন, তাহাই আবার পৃথিবীতে পতিত হয়।

সমুদ্রই মেঘোৎপত্তির সর্ব্বপ্রধান কারণ; ইহা হইতেই ভূরি পরিমাণ জলীয় বাষ্প সমুত্থিত হইয়া থাকে। মেঘ সমূহ প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথমতঃ যে সকল মেঘ খণ্ড খণ্ড ভাবে আকাশে বিচরণ করিতে থাকে এবং শুভ্রবর্ণ দেখায় তাহাদিগকে এক শ্রেণীতে সন্নিবেশিত করা যায়; এই মেঘে বৃষ্টি, বিদ্যুৎ বা বজ্রাঘাত দৃষ্ট হয় না ইহা অত্যন্ত উর্দ্ধে অবস্থিতি করে। বেলুন যন্ত্র সহযোগে ৭০০০ গজ উপরে উঠিলেও দেখা যায় যে, ঐ সকল মেঘ পৃথিবী হইতে যত উর্দ্ধস্থিত বোধ হয়, সে স্থান হইতেও তত উর্দ্ধস্থিত বোধ হয়। অতদূর উপরে বায়ু অবশ্যই অতি শীতল এবং ঐ সকল মেঘ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তুষার কণাময় হইয়া থাকে। এই সকল মেঘ শরৎ ও বসন্তকালে প্রচুর পরিমাণে দেখা গিয়া থাকে। ইহাকে খণ্ডিত মেঘ কহা যায়। দ্বিতীয়তঃ পর্ব্বত শ্রেণীর ন্যায় স্তূপাকার মেঘরাজি প্রতিক্ষণ যে নানা আকার ধারণ করে তাহাকে অপর শ্রেণীর মধ্যে পাতিত করা যায়।

তৃতীয়তঃ সূর্য্যাস্ত ও সূর্য্যোদয়ের সময় নানাবর্ণে বিভূষিত এক প্রকার মেঘ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই তিন প্রকার মেঘই বর্ষণ পরিশূন্য। অপর যে চতুর্থ প্রকার মেঘ তাহাতেই বৃষ্টি হয়; তাহা পৃথিবীর অধিকতর নিকটে অবস্থিতি করে। ইহা ভূতল হইতে ৩০ গজ হইতে ৫০০০ গজ পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধে অবস্থিতি করিয়া থাকে।

সকল দেশে সমপরিমাণ বৃষ্টি হয় না; বিষুবরেখার সন্নিহিত স্থানেই অধিক বৃষ্টি হইয়া থাকে। ইহার কারণ এই যে ঐ সকল স্থানে সূর্য্যের প্রখর কিরণে অধিকতম সামুদ্রিক জলীয় বাষ্প সমুত্থিত হইয়া থাকে। মেঘ পর্ব্বত শৃঙ্গকে প্রাপ্ত হইলে অতি শীঘ্রই বৃষ্টিরূপে পরিণত হইয়া থাকে। হিমালয় পর্ব্বতের যে স্থান সমুদ্র হইতে ৪০০০ ফুট্ উন্নত, তথায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বৃষ্টি হইয়া থাকে। হিমালয় প্রদেশে বর্ষা-কালে ৭৫ ইঞ্চি হইতে ১০০ ইঞ্চি পর্য্যন্ত বৃষ্টি পতিত হয়। পর্ব্বতের অত্যুচ্চ প্রদেশে বর্ষণকারী মেঘ উত্থিত হয় না; এইজন্য যাহারা উক্ত স্থানে অবস্থিতি করে তাহারা মেঘ করিয়াছে কিনা, বৃষ্টি হইতেছে কিনা তাহা নিম্নমুখে দর্শন করিয়া থাকে। এইজন্যই কালিদাস কহিয়াছেন যে, সিদ্ধগণ বৃষ্টিতে উদ্বেজিত হইলে গিরির শৃঙ্গদেশ আশ্রয় করিয়া থাকে। এবং ইংরাজী কবি গোল্ডস্মিথ্ কহিয়াছেন যে সাধুগণ উচ্চ পর্ব্বত সদৃশ; কারণ সাংসারিক চিন্তারূপ মেঘ তাঁহাদের হৃদয়দেশ পর্য্যন্ত স্পর্শ করে, কিন্তু তাঁহাদের মনোরূপ শৃঙ্গ সর্ব্বদাই ভগবৎ-ভাবনরূপ সূর্য্যালোকে চিরকাল প্রদীপ্ত থাকে।

পৃথিবীর সমীপস্থ বায়ুমধ্যে যে জলীয় বাষ্প থাকে তাহা সহসা শীতল হইলেই কুজ্ঝটিকা সমুৎপন্ন হয় মেঘ ও কুজ্ঝটিকা একই পদার্থ। অধিকতর শীতল হইলেই শিশির-বিন্দুরূপে পতিত হয়; আরও অধিক শীতল হইলে তুষারকণারূপে পতিত হইতে থাকে। আমাদের দেশে তুষার পতিত হয় না, তাহার কারণ, এদেশ শীতকালেও তত শীতল হয়

না। যে দিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে সেদিন শিশির পতিত হয় না ও গ্রীষ্ম অধিক হইয়া থাকে। ইহার কারণ এই সূর্য্যাস্তের পর সূর্য্যোত্তাপে তাপিত ভূমি হইতে তাপ উত্থিত হইয়া যাইতে পারে না এই জন্য বায়ু শীতল হইতে পারে না। আন্তরীক্ষ জলের মধ্যে বৃষ্টিজলই সর্ব্বপ্রধান।

বৃষ্টির প্রভাবে পৃথিবীতে নানা শুভাশুভ ঘটনা সংঘটিত হইয়া থাকে। উদ্ভিজ্জ, নদী ও জীবগণের জীবন প্রধানতঃ বৃষ্টির উপরই নির্ভর করিয়া থাকে। যেবারে আমাদের দেশে বৃষ্টি স্বল্প হয় সেবারে শস্যাভাবে যে কিরূপ হাহাকার উত্থিত হয় তাহা সকলেই বিদিত আছেন। বৃষ্টির জলেই নদী সরোবরাদির উৎপত্তি ও স্থিতি বলিতে হইবেক। পর্ব্বতে প্রচুর বৃষ্টি পতনেই নদীর প্রথম জন্ম হইয়া থাকে; পর্ব্বতস্থ জল বেগে নিম্ন ভাগে আসিয়া, নানা স্থানের নানা জলস্রোতের সহিত মিলিত হইয়া ক্রমশঃ বিপুলাঙ্গী তরঙ্গিণীরূপে সাগর-গামিনী হইয়া থাকে। বৃষ্টিজল ভূমিতলে পতিত হইলে তাহার ভূরিভাগ ভূমিমধ্যে শোষিত হইয়া থাকে। ইহাতে যখন সূর্য্যতাপে নদীসরোবরাদির জল শুষ্ক হইতে থাকে, তখন উক্ত শোষিত জল ভূমির নিম্নস্থ সূক্ষ্ম নলবৎ পথদ্বারা প্রবাহিত হইয়া নদী বা সরোবরে প্রবিষ্ট হয়। ইহাতে গ্রীষ্মকালেও জীবগণ জলের অভাব অনুভব করিতে পারে না। আবার বৃষ্টিজলে সময়ে সময়ে মহা অনিষ্টও উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐ সকল অনিষ্টের মধ্যে নদীর বন্যা অতীব ভয়ঙ্কর।

যখন পর্ব্বতাদিতে বহুল বারিবর্ষণ হয়, তখন সেই জলরাশি অবতীর্ণ হইয়া নদীখাত মধ্যে প্রবেশ করে। যদি নদীখাতে ঐ সমস্ত জলের সংকুলান না হয় তাহা হইলে উভয় কূল বহুদূর পর্য্যন্ত জলমগ্ন করিয়া থাকে। ইহাতে গ্রাম ও শস্যক্ষেত্রাদি বিনষ্ট হইয়া যায়। এই অনিষ্ট নিবারণের জন্য লোকে নদীর উভয় কূলে বাঁধ বা উচ্চ মৃত্তিকার পাড় প্রস্তুত করিয়া থাকে। কখন কখন প্রবল জলবেগে বাঁধের কোন স্থান

ভগ্ন হইলে, সেই স্থান দিয়া অতি প্রবলবেগে জলপ্রবাহ গ্রামাভিমুখে ধাবমান হয়, এবং যাহা কিছু সম্মুখে পায় ভাসাইয়া লইয়া যায়। যে স্থানে জল বেগে বাঁধ ভগ্ন হয়, সেই স্থানে এক নূতন নদী সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। এই নদীকে হানা কহিয়া থাকে।

বিদ্যুৎ ও বজ্রধ্বনি।

জগতের সকল পদার্থেই তড়িৎ নামে এক তেজ বর্ত্তমান থাকে, ক্রিয়াবিশেষ দ্বারা তাহা পরিস্ফুট হয় ও মনুষ্যের ইন্দ্রিয় গোচর হইয়া থাকে। তড়িতের তেজ অতি ভয়ঙ্কর, যখন পরিস্ফুট হয় তখন উহার তুল্য তেজ আর কোন পদার্থে দৃষ্টিগোচর হয় না। অগ্নি অপেক্ষাও ইহার তেজ বহুগুণে অধিক। এই তড়িতের দুই বিপরীত গতি আছে; তাহার একটীকে সংযোজক তড়িৎ ও অপরটীকে বিয়োজক তড়িৎ কহিয়া

থাকে। যে পদার্থে তড়িৎ পরিস্ফুট হয় সেই পদার্থের নিজের দিকে যে তড়িতের গতি তাহাকে সংযোজক, ও সেই পদার্থ হইতে যে তড়িতের অন্যত্র গতি তাহাকে বিয়োজক তড়িৎ কহিয়া থাকে। যে সকল পদার্থের পরমাণু সমূহ ক্রমশঃ দূরবিক্ষিপ্ত হয় অথবা পরস্পর সন্নিকটবর্ত্তী হয়,

তাহা হইতে সহজেই তড়িৎ পরিস্ফুট হইয়া থাকে। এই জন্য জল, ধাতু ও বায়ু হইতে সহজেই তড়িৎ পরিস্ফুট হয়। অন্তরীক্ষস্থ বায়ু মধ্যে বহুল পরিমাণ তড়িৎ অবস্থিতি করে, কিন্তু তাহা আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারি না। যে মেঘে বিদ্যুৎ ও বজ্রধ্বনি হয় তাহাতে ভূরি-পরিমাণ তড়িৎ অবস্থিতি করে। ঐ তড়িৎ উভয় জাতীয় এবং বহুদূরস্থ পদার্থের উপরও স্বীয় ক্রিয়া প্রদর্শন করিয়া থাকে। এইজন্য আবার সময়ে যে সকল পদার্থে তড়িৎ অনুভূত হয় নাই, মেঘের সময়ে তাহাও অত্যন্ত তড়িৎ-ময় হইয়া উঠে। মেঘস্থ সংযোজক তড়িৎ কর্ত্তৃক ভূমধ্যস্থ পদার্থের সংযোজক তড়িৎ আকৃষ্ট হইয়া থাকে এবং মেঘস্থ বিয়োজক তড়িৎ ভূগর্ভের দিকে আনীত হয়। যে তড়িৎ ভূগর্ভের দিকে আনীত হয় তাহার স্থান অধিকার করিবার নিমিত্ত সংযোজক-তড়িৎ তাহার দিকে ধাবিত হইবার চেষ্টা করে। এই তড়িৎ নানাবিভাগ হইতে আগমন করিয়া একত্র মিলিত হইতে উদ্যত হয়, কিন্তু আন্তরীক্ষ বায়ু ও মেঘকণাসমূহদ্বারা বাধা পাইয়া থাকে। যখন তড়িতের প্রবলতেজ উক্ত বাধাকে অভিভূত করিয়া একত্রীভূত হয়, তখনই আমরা বিদ্যুৎ দেখিতে পাই ও বজ্রধ্বনি শুনিতে পাই। আলোক ও শব্দ এক সময়েই সমুদ্ভূত হয় বটে, কিন্তু শব্দ অপেক্ষা আলোকের গতি দ্রুত, এই জন্য অগ্রে বিদ্যুৎ দেখিতে পাই ও কিয়ৎক্ষণ পরে শব্দ শুনা যায়। যে বিদ্যুৎ বা বিয়োজক তড়িৎ ভূমির দিকে আগমন করে তাহা তিন প্রকার, উহার মধ্যে প্রথম দুই প্রকার অতিক্ষণস্থায়ী কিন্তু তৃতীয় প্রকার তড়িৎ কিছু দীর্ঘকাল অবস্থিতি করে। এই শেষোক্ত প্রকার তড়িৎ অগ্নিগোলকের মত আকৃতিবিশিষ্ট এবং অট্টালিকা ও বৃক্ষাদির উপর স্বীয় ক্রিয়া প্রদর্শন করাইয়া থাকে।

১৭৪৯ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা নবেম্বর, মণ্টেগ্ নামক এক ইংলণ্ডীয় অর্ণব-যানের নাবিকগণ উত্তর সমুদ্রে উক্ত জাহাজ হইতে এক আশ্চর্য্য দৃশ্য

অবলোকন করিয়াছিল। তাহারা দেখিল এক বৃহৎ গোলাকার কিঞ্চিৎ নীলের আভাযুক্ত যেন এক অগ্নিপিণ্ড সমুদ্রের জলের উপর গড়াইতে গড়াইতে জাহাজের দিকে আসিতেছে। তখন আকাশ পরিষ্কার ছিল এবং তখন সময় দিবা দুই প্রহরের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব। জাহাজ হইতে যখন অল্প দূরে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন সহসা ঐ অগ্নিপিণ্ডবৎ পদার্থ সমুদ্র হইতে উপরে উত্থিত হইল এবং মধ্যস্থ বৃহত্তম মাস্তুলের অগ্রভাগে অতি ভীষণ শব্দের সহিত অবতীর্ণ হইল। মাস্তুলটা অগ্রভাগ হইতে মূল পর্য্যন্ত বিদীর্ণ হইয়া গেল। পাঁচজন নাবিক অচৈতন্য হইয়া পড়িল, তাহার মধ্যে এক জন অতিশয় দগ্ধ হইয়াছিল। যখন ঐ তড়িৎ-গোলক অদৃশ্য হইয়া গেল তখন অত্যন্ত গন্ধকদাহের ন্যায় গন্ধ অনুভূত হইতে লাগিল।

১৮২৬ খৃষ্টাব্দে এক ভয়ঙ্কর বজ্রধ্বনির পর কুক্কুট-ডিম্বপরিমাণ এক অগ্নিগোলক ভ্যান্ ডার্ স্মিসেন্ নামক এক ভদ্রলোকের অট্টালিকায় প্রবেশ করে। ভদ্রলোকটী যে গৃহে বসিয়া ছিলেন, ঐ অগ্নিগোলকটা সেই গৃহের মসৃণ মেজের উপর দিয়া যেমন ইঁদুর চলিয়া যায় তদ্রূপ গমন করিয়া সিঁড়ির মধ্যে নামিল এবং একেবারে নীচে অবতীর্ণ হইয়া অদৃশ্য হইল। ইহাতে কোন ক্ষতি লক্ষিত হয় নাই।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ৮ই ফেব্রুয়ারি বিলাতের এক স্কুলবাড়ীতে বজ্রাঘাত হয়। বেলা ১॥০টার সময় যখন বালকেরা আহারান্তে গল্প করিতে ছিল তখন সহসা তাহাদের মধ্যে খড়ি, কাষ্ঠখণ্ড ও প্রস্তরখণ্ড পতিত হইতে লাগিল। অত্যন্ত গোলযোগ বাড়িয়া গেল এবং একটী ছোট অগ্নিপিণ্ড চেয়ার বেঞ্চ প্রভৃতির নীচে দিয়া আসিয়া শিক্ষকের নিকট-দিয়া চলিয়া গেল। ইহাতে শিক্ষকের পরিধেয় কিঞ্চিৎ দগ্ধ হইল। উক্ত শিক্ষকের পুত্র একটা ল্যাম্পের নীচে দণ্ডায়মান ছিল, সে সহসা মৃত হইয়া পতিত হইল এবং অপর কএকজন বালকও তৎক্ষণাৎ মৃত

হইল। তৎপরে উক্ত অগ্নিপিণ্ড এক জানালার সার্সি ভাঙ্গিয়া বাহিরে গমন করিল এবং অদৃশ্য হইয়া গেল।

মেঘস্থ তড়িতের ক্রিয়া ভূপৃষ্ঠস্থ সমস্ত পদার্থের উপরিই সঞ্চালিত হয়, তবে যে সকল পদার্থ প্রবল তড়িৎ সঞ্চালক তাহাতেই অধিক অনুভূত হইয়া থাকে। ধাতু, স্রোতবিশিষ্ট জল, আর্দ্রভূমি, গন্ধকাদি খনিজ পদার্থ এবং বৃক্ষ ইহারা প্রবল তড়িৎ পরিচালক। মেঘ হইতে তড়িৎ নামিয়া আসিয়া এই সকল পদার্থের দিকেই গমন করে। আবার যে পদার্থ সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত তাহাতেই অগ্রে আঘাত লাগিয়া থাকে। এইজন্য উচ্চ বৃক্ষ ও অট্টালিকায় সর্ব্বাগ্রে পতিত হইবার সম্ভাবনা। অট্টালিকার পার্শ্বে যে এক শিক বা ধাতবশলাকা সংস্থাপিত থাকে, তাহার মূলভাগ মৃত্তিকা বা জলে সংযুক্ত থাকে এবং তাহার অগ্রভাগ গৃহছাদ হইতে উন্নত। অট্টালিকায় বজ্রাঘাত হইবার উপক্রম হইলে উক্ত শলাকাদ্বারা আকৃষ্ট ও ভূতলে নীত হয়। বিস্তীর্ণ প্রান্তর বা মাঠে উন্নত পদার্থ কিছুই না থাকিলে যদি এক আঁটী খড় বা তদ্রূপ পদার্থ ভূমিতে পড়িয়া থাকে, তাহাতেই বজ্রাগ্নি সংলগ্ন হয়। মেঘের সময়ে মাঠে চলা বিপদজনক কারণ মাঠে বজ্রাঘাত হইলে তত্রস্থ মনুষ্যাদির উপরেই পতিত হয়। যদি মাঠে চলিবার সময় সহসা মেঘ আইসে ও বিদ্যুৎ হইতে থাকে তাহা হইলে কোন আলের নিকট বা কোন নিম্ন স্থানে শয়ন করিয়া থাকা উচিত। পরে মেঘ চলিয়া গেলে উত্থিত হওয়া উচিত।

আলোকের নানাবিধ ক্রিয়া।

আশ্চর্য্য প্রতিবিম্ব।

ইয়ুলোয়ানামক এক বিখ্যাত পর্য্যটক একদিন অরুণোদয় কালে পাম্বামার্কা নামক পর্ব্বতচূড়ায় সহচরবর্গসমেত আরোহণ করিয়াছিলেন। আরোহণ কালে সেস্থান ঘন কুজ্ঝটিকায় আচ্ছাদিত ছিল, কিন্তু সূর্য্য উদয় হইলেই ক্রমে তাহা দূরীভূত হইল। ক্রমে আকাশ পরিস্কৃত ও নীলবর্ণ দৃষ্ট হইতে লাগিল। কেবল সামান্য পাতলা মেঘ আকাশের স্থানে স্থানে দেখা যাইতে লাগিল। এই সময় সহসা সূর্য্যের বিপরীত-দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া একব্যক্তি এক আশ্চর্য্য ব্যাপার সন্দর্শন করিল। সে দেখিল যে তাহার নিকট হইতে প্রায় বার ফুট অন্তরে ঠিক্ তাহারই ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট অপর এক জন তাহারদিকে মুখ ফিরাইয়া চাহিয়া রহিয়াছে। সে যেন তিনটী গোলাকার বলয়ের মধ্যস্থলে অবস্থিত। ঐ বলয় তিনটীর পরিধির একদিক ভূমিতল স্পর্শ করিতেছে ও তাহার বিপরীত দিক্ উক্ত মূর্ত্তির মস্তকোপরিভাগে অবস্থিত। ঐ বলয়বৎ তিনটী রেখা ইন্দ্রধনুর ন্যায় নানাবর্ণে বিভূষিত, এবং একটী আর একটীর ভিতর অবস্থিত সুতরাং ক্রমশঃ ক্ষুদ্রতর। ঐ তিনটী রেখার ও তাহাদের মধ্যস্থিত মূর্ত্তির চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া ঐরূপ আর একটী অতি বৃহত্তর বলয় ঐ ভাবে অবস্থিতি করিতেছে। এই বলয় একমাত্র বর্ণে রঞ্জিত। এই ব্যাপার দেখিয়া সে অপরকে উক্ত দৃশ্য লক্ষ্য করিতে কহিল। কিন্তু তাহারা যখন ফিরিল তখন সকলেই নিজ নিজ প্রতিমূর্ত্তি অবলোকন করিতে লাগিল। অপরের প্রতিকৃতি অপরে দর্শন করিতে পাইল না। ক্রমে ঐ সমস্ত বলয় ও

মূর্ত্তি সূর্য্যগতির সঙ্গে সঙ্গে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া শেষে বিলয় প্রাপ্ত হইল। উক্ত অসাধারণ দৃশ্যকে "ইউলোয়া-বলয়" কহিয়া থাকে। অজ্ঞ লোক একাকী যদি ঐ দৃশ্য দর্শন করিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই উপদেবতা বোধে অতিশয় ভীত হইত সন্দেহ নাই। সৌভাগ্যক্রমে উহা বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের চক্ষে পতিত হওয়ায়, যদিও ঐরূপ দৃশ্য কেহ কখন দেখে নাই তথাপি উহা যে প্রাকৃত নিয়মের বশীভূত তাহা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। যে কারণে ইন্দ্রধনু সমুৎপন্ন হয় সেই কারণেই উক্ত বলয়ের আবির্ভাব হইয়াছিল এবং দর্পণবৎ সূক্ষ্ম জলবিন্দু সমূহের মধ্যে দর্শকেরই প্রতিবিম্ব পড়িয়াছিল।

হঙ্গেরি দেশে হার্জ পর্ব্বতের ব্রোকন্ নামক সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় দৈত্যগণ ক্রীড়া করিয়া থাকে, এইরূপ কিম্বদন্তী চিরকাল চলিয়া আসিয়াছিল। লোকে ভয়ে ঐ চূড়ায় আরোহণ করিত না। অবশেষে কোন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত অনুসন্ধানার্থ এক দিন অপরাহ্নকালে উক্ত পর্ব্বত চূড়ায় আরোহণ করিয়াছিলেন। তখন আকাশ মেঘ-শূন্য ও নির্ম্মল ছিল। তিনি তথায় আরোহণ করিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন, এমন সময় পূর্ব্বদিকে হঠাৎ দৃষ্টি পতিত হওয়ায় এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য অবলোকন করেন। দেখিলেন যেন পূর্ব্বদিকে গগনমধ্যে এক অতি বৃহৎ মনুষ্যাকৃতি দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তিনি উহা দেখিয়া প্রথমতঃ বিস্মিত হইলেন এবং উহা কিসের মূর্ত্তি হওয়া সম্ভব তাহা ভাবিতে লাগিলেন। অবশেষে স্থির করিলেন ইহা তাঁহার নিজেরই ছায়া হওয়া সম্ভব; এই বলিয়া তিনি হস্তপদ সঞ্চালন ও নানারূপ অঙ্গভঙ্গী করিতে লাগিলেন। ইহাতে উক্ত ছায়াতেও ঐ প্রকার অঙ্গভঙ্গী হইতে লাগিল। তখন তিনি নির্ণয় করেন যে হার্জপর্ব্বতের পূর্ব্বদিকে প্রায়ই ঘন জলীয়বাষ্প অবস্থিতি করে। দূর হইতে তাহা দেখা যায় না, কিন্তু সূর্য্যাস্তের সময় সকল বস্তুর ছায়া যখন পূর্ব্বদিকে

পতিত হয়, তখন প্রাচীরাদিতে যেমন ছায়া পতিত হয়, তদ্রূপ উক্ত ঘন বাষ্পরাশিমধ্যে ছায়া পতিত হইয়া থাকে। ইহাতেই বোধ হয় আকাশে যেন এক ভয়ঙ্কর কৃষ্ণবর্ণ আকৃতি অবস্থিতি করিতেছে। অদ্যাপি ঐরূপ ঘটনা ঘটিয়া থাকে কিন্তু লোকে আর উহা দেখিয়া ভীত হয় না।

মহাসমুদ্রে ও বালুকাময় সুবৃহৎ মরুভূমিতে সূর্য্যের উত্তাপ ও আলোকের প্রতিঘাত এই উভয় কারণে নানারূপ আশ্চর্য্য প্রতিবিম্ব অবলোকন করা যায়। মরুভূমিতে যে জলভ্রম হয়, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। আমাদের দেশে উহাকে মরীচিকা বা মৃগতৃষ্ণিকা কহিয়া থাকে। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে উত্তপ্ত বালুকা দ্বারা লঘূকৃত আন্তরীক্ষ বায়ুরাশি উপরে উত্থিত হইয়া ঘনতর বায়ুর সংস্পর্শে স্বচ্ছ কাচদ্বয়ের সংযোগ তুল্যতা ঘটাইয়া থাকে। ইহাতে আকাশের প্রতিবিম্ব বালুকারাশির উপর পতিত হয়। তাহা দূর হইতে দেখিলে তরঙ্গায়িত নীলজল পরিপূর্ণ ও তীরস্থ তালবৃক্ষের প্রতিবিম্ব সংযুক্ত বৃহৎ হ্রদের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। উষ্ট্র ভিন্ন অপর সকল প্রাণীই ভ্রমে পতিত হইয়া থাকে।

মরুভূমিতে সময়ে সময়ে আর এক আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখা গিয়া থাকে। কখনও এরূপ দেখা যায়, যেন অতিদূরে আকাশের উপর একটা বৃহৎ উষ্ট্র অবস্থিতি করিতেছে; তাহার পদ-চতুষ্টয় যেন আকাশের দিকে ও পৃষ্ঠদেশ নিম্নাভিমুখে অবস্থিত। ক্রমে ঐ আকৃতি ক্ষুদ্র দেখাইতে থাকে; ক্রমে ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইয়া অবশেষে যেন একটী কৃষ্ণবর্ণ চিহ্নের ন্যায় বোধ হয়, ক্রমে তাহাও দূরীভূত হয়। তাহার কিঞ্চিৎ পরেই দেখিতে পাওয়া যায় যে সেইদিকে অতিদূরে ভূমির উপর দিয়া একটা উষ্ট্র আগমন করিতেছে। এই শেষোক্ত উষ্ট্রই প্রকৃত উষ্ট্র, পূর্ব্বোক্ত বিপরীতভাবে অবস্থিত আকাশস্থ উষ্ট্র উহারই প্রতিবিম্ব।

প্রকৃত উষ্ট্র যখন চক্রবাল রেখার বহির্ভাগে থাকায় সম্পূর্ণ দৃষ্টি পথের বহির্ভাগে ছিল তখন উহার প্রতিবিম্ব আকাশস্থ বাষ্পমধ্যে পতিত ও তাহাই আবার অধোভাগে প্রতিফলিত হওয়ায় ঐরূপ প্রতিবিম্ব দৃষ্টি-গোচর হইয়া থাকে। যেমন দুইখানি দর্পণ পরস্পর সম্মুখবর্ত্তী করিয়া বসাইলে, একখানিতে যে প্রতিবিম্ব পতিত হয়, অপরখানিতে সেই প্রতিবিম্বেরই প্রতিবিম্ব পতিত হইয়া থাকে, সেইরূপ উষ্ট্রের প্রতিবিম্ব দ্বিগুণিত হওয়ায় বিপরীতভাবে দৃষ্টিগোচর হয়।
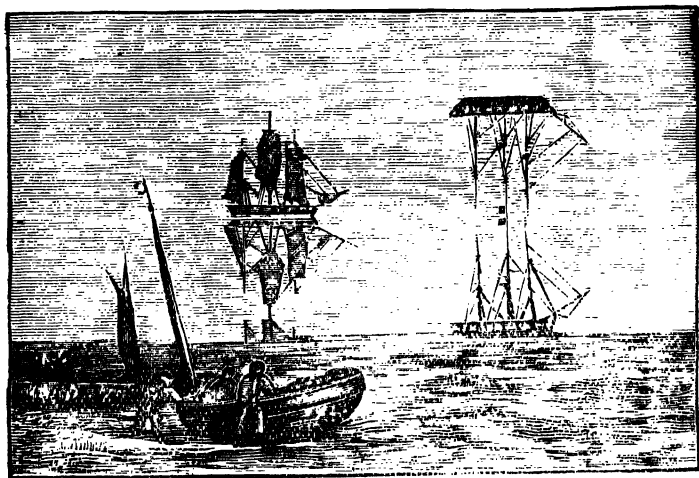
মহাসমুদ্রেও সময়ে সময়ে ঐ প্রকার দৃশ্য অবলোকন করা যায়। সুবিখ্যাত নাবিক স্কর্সবি ১৮২২ খৃষ্টাব্দে উত্তর-মহাসমুদ্রে ভ্রমণ করিতে করিতে একদিন দেখিলেন কিয়দ্দূরে আকাশের মধ্যে যেমন একখানা জাহাজ ঝুলিতেছে। তাহার মাস্তুল প্রভৃতি অধোভাগে এবং তলদেশ উপরিভাগে অবস্থিত। উক্ত নাবিক দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে উক্ত লম্বমান জাহাজখানি বিশিষ্টরূপে দেখিতে লাগিলেন। তিনি জাহাজের যে স্থানে যে বস্তুটী আছে তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন এবং বুঝিলেন

যে উক্ত জাহাজখানি তাঁহার পিতার জাহাজের ন্যায়। পরে যখন তাঁহার পিতার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং ঐ সম্বন্ধে কথোপকথন হইয়াছিল তখন জানা গেল যে স্কর্সবি সাহেব স্বীয় পিতার জাহাজেরই প্রতিবিম্ব সন্দর্শন করিয়াছিলেন। যে সময় প্রতিবিম্ব দেখা গিয়াছিল। তখন প্রকৃত জাহাজখানি ৩০ মাইল অন্তরে এবং চক্রবাল রেখার ১৭ মাইল অন্তরে অবস্থিতি করিয়াছিল। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে মে মাসে আর্চার নামক রণতরির অধ্যক্ষ বল্টিক সমুদ্রে ঐ প্রকার দৃশ্য অবলোকন করিয়া ছিলেন। তিনি দেখেন সমগ্র একদল রণতরি যেন আকাশে উক্তরূপে লম্বমান রহিয়াছে। এস্থলেও তাঁহাদের পরস্পর দূরত্ব ৩০ মাইল ছিল।

উক্তবৎসর ২৬ জুন ইংলণ্ডের হেষ্টিংস্ নামক স্থান হইতে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য সর্ব্বলোকের নয়ন পথে পতিত হয়। ফ্রান্সের যে উপকূল-ভাগ ইংলণ্ডেরদিকে অবস্থিত সেই সমস্তই যেন আকাশের উপর কে তুলিয়া ধরিয়াছে, এইরূপ অনুভূত হইয়াছিল। হেষ্টিংস্ হইতে ফ্রান্সের উপকূল পঞ্চাশ মাইলের উপর সুতরাং সাধারণ মনুষ্যের সম্পূর্ণ দৃষ্টিপথাতীত; কিন্তু তাহার প্রতিবিম্ব স্পষ্ট আকাশপথে পতিত হওয়ায় হেষ্টিংস্ নগরের সকল লোকেই উহা দর্শন করিয়াছিল। এই প্রতিবিম্ব বিপরীতভাবে অবস্থিত নহে, স্বাভাবিক ভাবেই অবস্থিত ছিল। উক্ত ব্যাপার তিনঘণ্টা স্থায়ী হয়।

ডাক্তার ভিন্স যে এক ঘটনার উল্লেখ করেন, তাহা আরও আশ্চর্য্য। তিনি বলেন, রাম্স্গেট্ নামক স্থান হইতে দেখা যায় যে মধ্যস্থিত এক পর্ব্বতের অপরদিকস্থিত ডোভার কাস্ল্ নামক দুর্গের চারিটী উচ্চ মঞ্চ যেন পর্ব্বতের এধারে আনীত হইয়াছে। এই প্রতিবিম্ব এরূপ ঘন যে তাহার মধ্য দিয়া পর্ব্বতের আকৃতি লক্ষ্য করা যায় না।

মেসিনা প্রণালীর কূলভাগ হইতে প্রায়ই দেখা যায় যে মনুষ্য, গো, অশ্ব, গৃহ ইত্যাদি আকাশে ক্রমে ক্রমে দেখা দিতেছে; ক্রমে ক্রমে

অনুভব হয় যে আকাশরূপ সুবৃহৎ হ্রদমধ্যে উক্ত নানাবিধ বস্তু লম্বভাবে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। কখন কখন এরূপ দৃশ্যও দেখা গিয়াছে যে উচ্চ পর্ব্বতাদিস্থ গ্রাম সমূহ যেন সমতল ভূমিতে আনীত হইয়াছে।

উক্তপ্রকার আশ্চর্য্য প্রতিবিম্বকে ইংরাজীতে "ফেটা মর্গানা" কহিয়া থাকে। কিরূপে দৃষ্টিপথের অতীত বস্তু প্রতিবিম্বরূপে আকাশে দৃশ্যমান হয়, তাহা সহজেই বোধগম্য হইতে পারে। আলোকের প্রতিঘাতে ঐরূপ হইয়া থাকে। একটী সামান্য বিষয় লইয়া বুঝিয়া দেখ। একটী বাটির মধ্যভাগে একটী মুদ্রা সংস্থাপন করিয়া বাটিটা একস্থানে রাখ; তৎপরে বাটির নিকট হইতে হটিয়া কিয়দ্দূরে গমন কর। যখন দেখিবে বাটির কাণাদ্বারা মুদ্রাটী ঢাকা পড়িল, আর দেখা গেল না, তখন স্থির হইয়া দাঁড়াও। এক্ষণে অপর কোন ব্যক্তিকে —উক্ত পাত্রে এরূপে জল ঢালিতে বল যেন মুদ্রাটী ঠিক সেই স্থানেই থাকে। এক্ষণে উক্ত বাটির দিকে চাহিয়া দেখ; দেখিবে মুদ্রাটী পুনর্ব্বার দেখা যাইতেছে। জল ফেলিয়া দিলে আর দেখা যাইবে না। ইহার কারণ এই চক্ষুর জ্যোতিঃ বাটির জলে গমন করিয়া বাধা পায় এবং তজ্জন্য অধোভাগে ঘুরিয়া যায়। এক্ষণে জল যদি স্বচ্ছ হয় তাহা হইলে তন্মধ্য দিয়া নিম্নস্থ পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয়। সরল দৃষ্টিতে কোন বস্তু দেখিতে না পাইলে যেমন উঁকি দিয়া দেখা যায়, ইহাও তদ্রূপ-ভাবেই দৃষ্টিগোচর হয়।

অনুকৃত চন্দ্র ও অনুকৃত সূর্য্য।

চন্দ্র ও সূর্য্য কিরণে অপর এক অদ্ভুত ব্যাপার সংঘটিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে এক প্রকার খণ্ডিত মেঘ আছে যাহা বহু উন্নত স্থানে অবস্থিতি করে এবং যাহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তুষারকণা দ্বারা সংগঠিত। নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশে সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত সময়ে অথবা
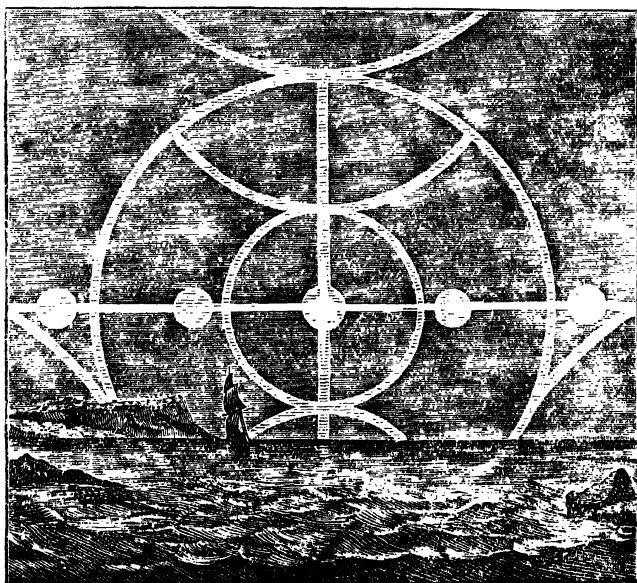
চন্দ্র যখন চক্রবাল রেখার নিকট অবস্থিতি করে, তখন কদাচিৎ সূর্য্য বা চন্দ্রের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া আলোকময় গোলাকার বৃহৎ বৃত্ত সমূহ উক্ত প্রকার মেঘোপরি সমুদিত হইয়া থাকে। মধ্যস্থলে সূর্য্য বা চন্দ্র, তৎপরে তৎ-পরিবেষ্টক এক ক্ষুদ্রতর বৃত্ত, তাহার বহির্ভাগে অপর এক বৃহত্তর বৃত্ত এবং ঐ সকল বৃত্তের অবচ্ছেদক ব্যাস ও বৃত্তাংশ আলোকময় হইয়া দর্শকের বিস্ময় উৎপাদন করে। আবার, প্রত্যেক বৃত্তের বহির্ভাগে উভয়দিকে অবচ্ছেদক ব্যাসের উপরিভাগে এক এক খণ্ড-আলোকময় গোলাকার স্থান দৃষ্টিগোচর হয়। এই আলোকময় গোলাকার পদার্থকে অনুকৃত সূর্য্য বা অনুকৃত চন্দ্র কহিয়া থাকে। ক্ষুদ্রতর বৃত্তের বহির্ভাগে যে আলোকখণ্ড তাহা ইন্দ্রধনুর ন্যায় নানাবর্ণে

বিভূষিত, কিন্তু দূরবর্ত্তী আলোকখণ্ড সমূহ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া থাকে। যে সকল বৃত্তাংশ বা চাপ-খণ্ড উক্ত সম্পূর্ণ বৃত্তের অঙ্গস্পর্শ করে, তাহারা সংস্পৃষ্ট-স্থানে উজ্জ্বল আলোক সমুৎপন্ন করে। এইরূপ দৃশ্য প্রায়ই সংঘটিত হয় না, কিন্তু সূর্য্য বা চন্দ্রমণ্ডলকে বেষ্টন করিয়া এক আলোকময় বৃহৎ বৃত্তকে সমুদিত হইতে প্রায়ই দেখা যায়। আমাদের দেশেও যখন আকাশে ঐ প্রকার অল্প অল্প মেঘ থাকে তখন প্রায়ই ঐরূপ দৃশ্য সমুৎপন্ন হয়। তখন ঐ গোল রেখাকে লোকে "চন্দ্রমণ্ডল" বা "সূর্য্যমণ্ডল" কহিয়া থাকে। অজ্ঞ লোকেরা কহে দেবগণ সভা করিয়া উপবেশন করেন এবং চন্দ্র বা সূর্য্য সভাপতি হয়।

অরোরা বরিয়ালিস্ বা মেরুস্থ আলোক।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে মেরুসন্নিহিত স্থানে ছয়মাস ক্রমাগত দিন ও ছয়মাস ক্রমাগত রাত্রি হইয়া থাকে। আমাদের হিন্দুশাস্ত্রে কহে মনুষ্য পরিমাণের একবৎসরে দেবতা ও পিতৃলোকের এক দিবারাত্রি হইয়া থাকে। অনুমান হয় হিন্দুগণ উত্তর মেরুকে দেবতাস্থান ও দক্ষিণ মেরুকে পিতৃলোকের স্থান কল্পনা করিয়াছিলেন। কারণ, সুমেরুকে "সুরালয়" বা দেবতার আকাশ এই নামে অভিহিত করেন। এবং দক্ষিণ দিকের অধিপতি যমকে "পিতৃপতি" কহিয়া থাকেন। আবার, দেবতাদিগের যজ্ঞকাল উত্তরায়ণ এবং পিতৃলোকের যজ্ঞকাল দক্ষিণায়ন, এইরূপ কথিত হওয়ায় উত্তরায়ণকালে উত্তরমেরুতে দিবা এবং দক্ষিণায়নকালে দক্ষিণমেরুতে দিবা হইয়া থাকে, ইহা বোধ হয় তাঁহারা অবগত ছিলেন। উত্তর মেরুসম্বন্ধে অনেক বস্তু ক্রমশঃ আবিষ্কৃত হইতেছে, কিন্তু দক্ষিণ মেরুসম্বন্ধে অতি সামান্য বিবরণই প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। দক্ষিণ সমুদ্রে মেরুর অভিমুখে গমন করিতে

উন্নত হইলে কেবল প্রবলশীত ও তজ্জন্য তুষাররাশি দ্বারা অর্ণবযানের গতি অতিশীঘ্রই ব্যাহত হইয়া থাকে। ইহার কারণ এই দক্ষিণ মহা সমুদ্রে বৃহৎদ্বীপ বা আশিয়া মহাদেশাদির ন্যায় বৃহৎ উপদ্বীপ নাই, এই

জন্য সূর্য্য কিরণে বিশিষ্টরূপে উত্তপ্ত হয় এরূপ পদার্থ না থাকায় এবং অপরাপর কারণে উত্তর প্রান্ত অপেক্ষা দক্ষিণ প্রান্ত আরও দুর্গম হইয়া রহিয়াছে। দক্ষিণ দিকে যতদূর এপর্য্যন্ত জানা গিয়াছে তাহাতে এই বোধ হয়, যে দক্ষিণমেরু সন্নিহিত স্থানেও এক মহাদ্বীপ অবস্থিতি করা সম্ভবপর। কারণ দূর হইতে দূরবীক্ষণ সহযোগে দেখা যায় যে আশিয়াদি মহাদেশের উপকূল ভাগের ন্যায় কিয়দংশ স্থান বহুদূরে অবস্থিতি করিতেছে। কিন্তু এপর্য্যন্ত তথায় কেহ যাইতে পারে নাই।

উত্তর মেরুপ্রদেশে যে সমস্ত আশ্চর্য্য ব্যাপার পরিজ্ঞাত হওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে "অরোরা বরিয়ালিস্" নামক অদ্ভুত আলোক সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত। তথায় যখন ছয় মাস ক্রমাগত রাত্রি থাকে, তখন মনুষ্যগণ যে ছয় মাস ক্রমাগত নিদ্রা যাইবে তাহা সম্ভবপর নহে। দিন ও রাত্রি উভয় কালেই অবশ্য মধ্যে মধ্যে ভোজনাদি করিতে হয়, এবং মধ্যে মধ্যে নিদ্রা যাইতে হয়। কিন্তু রাত্রিকালের অন্ধকারে বাহিরের কার্য্য সম্পাদন করা অতীব দুরূহ; বিশেষতঃ তত্রত্য জনগণের মৎস্য ধারণ প্রধান জীবিকা, রাত্রিকালে অন্ধকারে বোটে উঠিয়া মৎস্যধারণ একপ্রকার অসম্ভব। পরম করুণাময় পরমেশ্বর তজ্জন্য তত্রত্য জনগণের প্রতি সদয় হইয়া এমন এক প্রকার আলোকের সৃষ্টি করিয়াছেন যে সেস্থান রাত্রিকালেও উষানুরূপ প্রদীপ্ত থাকে। তাহাতে সমস্ত কার্য্যই সম্পাদিত হইয়া থাকে। উত্তর গগনে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে শত শত অত্যুন্নত অগ্নিশিখার ন্যায় আলোকমালা অর্দ্ধগগন পরিব্যাপ্ত করত এক অনির্ব্বচনীয় শোভা ধারণ করিয়াছে। এই সকল আলোকশিখা সময়ে সময়ে নানা অবয়ব ধারণ করে এবং বোধ হয় যেন উহারা হেলিয়া দুলিয়া খেলা করিতেছে। কিরূপে যে উক্তপ্রকার আলোকের উৎপত্তি হয়, তাহা ভালরূপ জানা যায় নাই। অনেকে কহেন, মেরুস্থানে পৃথিবীর আবর্ত্তন বশত বায়ু বিঘর্ষিত হয়,

ইহাতে তড়িৎ পরিস্ফুট হওয়ায় উক্তরূপ আলোক পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। এই আলোকের নাম "অরোরা বরিয়ালিস্।" পৃথিবীর অতি উত্তরাংশে যেখানে চব্বিশ ঘণ্টায় দিবারাত্রি হয় তথায়ও রাত্রিকালে উক্তরূপ আলোক দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। আইসলণ্ড, নবজম্বালা প্রভৃতি দ্বীপে প্রতিদিন রাত্রিকালে উহা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। দক্ষিণ মেরু-প্রদেশেও উক্তরূপ আলোকের সম্ভাবনা, কিন্তু তাহা এপর্য্যন্ত কেহ দর্শন করে নাই।

ইন্দ্রধনু।

ইন্দ্রধনু বা রামধনু সকলেই সন্দর্শন করিয়াছেন। সূর্য্যোদয়ের কিয়ৎক্ষণ পরে অথবা সূর্য্যাস্তের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে সূর্য্যের বিপরীতদিকে নাতিঘন মেঘ পরিব্যাপ্ত হইলে এবং সেই মেঘের উপর সূর্য্যের কিরণ পতিত হইলে বৃহৎ সুরঞ্জিত যে অর্দ্ধবৃত্তাকার প্রতিবিম্ব দৃষ্টিগোচর হয়, তাহাই ইন্দ্রধনু বা রামধনু নামে অভিহিত হইয়া থাকে। অজ্ঞলোকে উক্ত ধনুরাকৃতি বিচিত্র প্রতিবিম্বের কারণ নির্ণয় করিতে না পারিয়া মেঘদেবতা ইন্দ্রের ধনু বলিয়া মনে ধারণা করিত, কিন্তু এক্ষণে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ উহার প্রকৃত কারণ নির্ণয় করিয়াছেন। ইন্দ্র-ধনুতে সাতপ্রকার বর্ণ দৃষ্টিগোচর হয়, তন্মধ্যে সর্ব্বনিম্নে বেগুণে ও সর্ব্বোপরি রক্তবর্ণ দেখা যায়। নির্ণীত হইয়াছে যে সূর্য্যমণ্ডলে উক্ত সাত প্রকার বর্ণ আছে, আকাশের মধ্য দিয়া যখন সূর্য্য কিরণ সপ্তবর্ণে পৃথিবীতে উপস্থিত হইতে থাকে, তখন তাহা নানারূপে বাধা পাইয়া মিশ্রিত হইয়া যায়, ইহাতেই সূর্য্য কিরণ শ্বেত অনুভব হইয়া থাকে। সাতবর্ণ মিলিত হইলে যে শ্বেত অনুভব হয়, তাহার পরীক্ষা সহজেই সম্পন্ন হইতে পারে। একখানি পাতলা পিস্‌বোর্ডনামক কাগজ ঠিক্ গোল করিয়া কাট ও তাহাতে ইন্দ্রধনুর মত সাতপ্রকার বর্ণ সমভাবে

লিপ্ত কর। সাত প্রকার বর্ণের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম রক্তবর্ণ ও সর্ব্বশেষে বায়লেট্ বা বেগুণে রং মাখাও, রক্তবর্ণের পরে কমলালেবুর মত রং, তৎপরে পীত, তৎপরে ক্রমে হরিৎ, নীল ও ধূমলবর্ণ লিপ্ত কর। এইরূপে উক্ত গোলাকার কাগজের এক পৃষ্ঠ সমস্ত রঞ্জিত হইলে, উহার মধ্য-ভাগে একটী ছিদ্র করিয়া তাহাতে একটী শঙ্কু অর্থাৎ পিন্ প্রবিষ্ট করাইয়া কাগজখানি বেগে ঘুরাইতে থাক। যখন গোল কাগজ খানি প্রবল বেগে ঘুরিতে থাকিবে, তখন সাতপ্রকার বর্ণের স্থলে সমস্তই শ্বেতবর্ণ অনুভূত হইবে।

সূর্য্য কিরণ আকাশ দিয়া নামিয়া আসিবার সময় উহাদের সাত প্রকার বর্ণ মিশ্রিত হয়, আবার জলীয় বাষ্পে পতিত হইলে ঐ সকল বর্ণ পৃথক্ পৃথক্ হইয়া পড়ে। তজ্জন্য ইন্দ্রধনুতে সাত প্রকার বর্ণ দৃষ্ট হয়। ত্রিকোণ কাচের মধ্যেও সূর্য্য কিরণের বর্ণ পৃথক্ হইয়া থাকে, সেইজন্য ঝাড়ের কলমে রৌদ্র লাগিলে ভূমিতলে ও প্রাচীরে নানা বর্ণের কিরণ পতিত হইতে দেখা যায়। সূর্য্য মণ্ডলে সাত প্রকার বর্ণ থাকিবার কারণ কি, তাহা এপর্য্যন্ত নিরূপিত হয় নাই। ত্রিকোণ কাচে সূর্য্য কিরণ যে পৃথগ্ভূত হইয়া থাকে অনুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা তাহা সন্দর্শন করিলে উক্ত সপ্তবর্ণ কিরণের মধ্যস্থলে বহুসংখ্যক কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হয়। ঐ সকল কৃষ্ণবর্ণ চিহ্নের অবশ্যই হেতু আছে; সূর্য্য-মণ্ডল হইতে কিয়দ্দূরে লৌহাদি ধাতু অতিশয় তাপ প্রযুক্ত বাষ্পাকারে অবস্থিত করিতেছে যে সকল স্থানে উক্ত প্রকার বাষ্প অবস্থিতি করে, তাহার মধ্যে দিয়া সূর্য্যকিরণ আসিতে পায় না, এইজন্য উক্ত প্রকার কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন লক্ষিত হইয়া থাকে। ঐ সকল চিহ্নের অবয়ব ও সংখ্যার সময়ে সময়ে পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে।

যখন ইন্দ্রধনুর উদয় হয়, তখনও দূরবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা উহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন অবলোকিত হইয়া থাকে। যখন ইন্দ্র

ধনুর উদয় হয়, অনেকেই দৃষ্টি করিয়াছেন, ঐ ইন্দ্রধনুর উপরিভাগে আর একখানি ক্ষীণ বর্ণ ইন্দ্রধনু উদয় হয়। ইন্দ্রধনু মেঘ ভিন্ন অপর স্থানেও উৎপন্ন হইতে পারে। জলপ্রপাত ও বৃহৎ তুষারখণ্ডেও ইন্দ্রধনু দৃষ্ট হয়। মুখ জল পূর্ণ করিয়া সূর্য্যের বিপরীত দিকে ফুৎকার করিলে যে সূক্ষ্ম জলকণা সমূহ উদ্ভূত হয় তাহাতেও ইন্দ্রধনু উৎপন্ন হইয়া থাকে। হিন্দুরা সূর্য্যকে "সপ্তাশ্বযুক্ত" কহিয়া থাকেন যে হেতু তাঁহারা কহেন; সূর্য্য প্রতিদিন অরুণকে সারথি করিয়া সপ্ত অশ্ব-যুক্ত রথে আরোহন পূর্ব্বক ভুবন পর্য্যটন করেন। বোধ হয় তাঁহারা সূর্য্যমণ্ডলস্থ সপ্তবিধ বর্ণের সত্তা অনুভব করিয়া সূয্যকে "সপ্তসপ্তি" বা "সপ্তাশ্ব" নামে অভিহিত করিয়াছেন। সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত কালে সূর্য্যের রক্তিমা বর্ণ লক্ষিত হইয়া থাকে। অপর বর্ণাপেক্ষা রক্তিমাবর্ণের সত্তা অধিক বলিয়াই ঐ প্রকার দৃষ্ট হয়।

উল্কাপাত ও নক্ষত্রপাত।

সূর্য্যাস্তের পর নির্ম্মল আকাশের দিকে কিয়ৎকাল অবলোকন করিতে করিতে দেখা যায় যেন এক একটী ক্ষুদ্র, নক্ষত্রবৎ, উজ্জ্বল পদার্থ আকাশ হইতে স্খলিত হইয়া বেগে অবতীর্ণ হইতেছে। ঐ আলোকময় পদার্থ যেন অধোগামী হাউই বলিয়া অনুভূত হয়; উহা কিয়দ্দূর নামিলেই আর দেখা যায় না। সময়ে সময়ে ঐ প্রকার পদার্থ প্রচুর পরিমাণে পতিত হইতে দেখা যায়; তখন বোধ হয় যেন অগ্নি বৃষ্টি হইতেছে। এই প্রকার দৃশ্যকে লোকে নক্ষত্রপাত কহিয়া থাকে। উহা যে বাস্তবিক নক্ষত্র নয়, তাহা বুদ্ধিমান্ মাত্রেই বুঝিতে পারে, কারণ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে এক এক নক্ষত্র অতি বৃহৎ গোলপিণ্ড, তাহা পৃথিবীতে পতিত হইলে পৃথিবীর প্রলয়কাল উপস্থিত হয়।

অসীম আকাশ মধ্যে যেমন চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবী ও তারাসমূহ বিচরণ করিতেছে, সেইরূপ আবার অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদার্থও অসংখ্য পরিমাণে শূন্য পথে বিচরণ করিতেছে। ঐ সকল পদার্থ ধাতব ও প্রস্তরবৎ পদার্থের ন্যায় বোধ হয়। উহারা বিচরণ করিতে করিতে যখন কোন বৃহৎ গোলপিণ্ডের মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির অধীনে আগমন করে তখন তৎকর্ত্তৃক উহারা আকৃষ্ট হইয়া থাকে। উহাদের মধ্যে যেগুলি আমাদের পৃথিবী দ্বারা আকৃষ্ট হয় তাহারাই পৃথিবীতে সংলগ্ন হইবার সময় আমাদের দৃষ্টি পথে পতিত হয়। যখন পৃথিবী পরিবেষ্টক বায়ু-রাশির মধ্যে প্রবেশ করে তখন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অগ্নি সমুদ্ভূত হইয়া উহাদিগকে প্রদীপ্ত করে। ইহাতেই আমরা আলোক অনুভব করি। অগ্নি প্রভাবে উক্ত পদার্থ সমূহ বিনষ্ট হইয়া যায়, এবং যখন পৃথিবীতে পতিত হয় তখন সামান্য ধূলার মত হইয়া পড়ে। কখন কখন উক্তরূপ পদার্থ বৃহদাকার হইয়াও থাকে। তাহা ভূতলে পতিত হইলেও বৃহদাকার দৃষ্টিগোচর হয়। উহারা যখন পতিত হইতে থাকে তখন আকাশে অপূর্ব্ব আলোকময় দীর্ঘাকৃতি প্রজ্বলিত কাষ্ঠাদির ন্যায় অনুভূত হইয়া থাকে। ইহাকেই লোকে উল্কাপাত কহিয়া থাকে। পৃথিবীর নানা স্থানে বৃহৎ উল্কাসমূহের অবশিষ্টাংশ পতিত হইয়া আছে। উহা প্রস্তর ও ধাতব পদার্থে গঠিত বলিয়া অনুভূত হয়।

আলেয়া।

লোকে সচরাচর আলেয়াকে এক প্রকার ভৌতিক ক্রিয়া মনে করিয়া থাকে। বাস্তবিক আলেয়া ভৌতিক ক্রিয়া বটে কিন্তু ভৌতিক ক্রিয়া বলিলে লোকে সচরাচর যেরূপ বুঝে তাহা নহে। ভূত অর্থাৎ মূল পদার্থ ঘটিত ক্রিয়াকে ভৌতিক কহা যায়। আলেয়া আর কিছুই নয়; ফস্‌ফরাস্ নামক বাষ্প প্রান্তরাদিতে পচা বৃক্ষাদি হইতে সমুৎপন্ন

হয়, তাহার সহিত হাইড্রজন নামক জলীয় গ্যাস মিশ্রিত হইলেই বায়ুসংযোগে আলোকময় হইয়া থাকে। খদ্যোতিকা অর্থাৎ জোনাক পোকার অবয়ব যে কারণে প্রদীপ্ত, আলেয়াও প্রায় সেই কারণেই প্রদীপ্ত হয়। জলাভূমিতেই আলেয়া পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। উহার অবয়ব সময়ে সময়ে নানা রূপ হয়; কখন বৃহৎ পিণ্ডাকার, কখন দীপশিখাতুল্য দৃষ্টি-গোচর হয়। এই আলোক সঞ্চারিত হইয়া ইতস্ততঃ গমন করিয়া থাকে। কখনও উর্দ্ধদেশে, কখনও ভূমির উপর, কখনও বা কোন পদার্থের অন্তরালে অবস্থিতি করে। অজ্ঞ লোকে আলেয়া দেখিয়া ভীত হয়, এই জন্য চোর প্রভৃতি দুষ্ট লোকেরা রাত্রিকালে যাইবার সময় কোন পাত্রে অগ্নি জ্বালাইয়া মাঠের উপর দিয়া গমন করে ও মাঝে মাঝে উহা আচ্ছাদন করে।

আলেয়া কখনও জলে নির্ব্বাণ হয় না, কারণ উহা অগ্নি হইতে উৎপন্ন নহে। পৃথিবীতে এমন অনেক পদার্থ আছে, যাহাতে অগ্নি ব্যতীত আলোক উৎপন্ন হইয়া থাকে। খদ্যোতিকা, দীপমক্ষিকা, উল্কামুখী খেঁকশিয়ালি এবং ওষধি নামক বৃক্ষবিশেষ এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

সম্পূর্ণ।

কর্ত্তব্য। পৃথিবীতে যে সাতটী আশ্চর্য্য পদার্থ আছে, তাহার ইতিহাস ও ছবি ইহাতে আছে। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য আশ্চর্য্যের বিষয় ছবিশুদ্ধ বিবৃত হইয়াছে। প্রত্যেক আশ্চর্য্যের ফটো ছবি আছে। উপহার দিবার সুন্দর পুস্তক। বিলাতি বাঁধান, মূল্য ॥০ আনা মাত্র।

সচিত্র প্রণয় পত্রিকা বা দাম্পত্য-সোহাগ।

ইহা প্রণয় বিরহাদিপূর্ণ সুললিত পদ্যে নানাবিধ ছন্দে সুন্দর সুন্দর
বিবিধ চিত্রসহ যুবক যুবতীর পরস্পর মনোরঞ্জনকারী
পবিত্র পত্র লিখিবার প্রণালী।
নূতন আকারে—৮ম সংস্করণ—মূল্য ।০ আনা।

বিবাহ আসর মাৎ করিবার—
নানা প্রকার ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত হেঁয়ালী পূর্ণ—

বরযাত্রীয় ও কন্যাযাত্রীয় ঠকানে প্রশ্ন।

১৩শ সংস্করণ—বিস্তর বাড়িয়াছে। মূল্য ⁄০ আনা মাত্র।

সুকুমারমতি বালকগণের পক্ষে শিক্ষাপূর্ণ নূতন ধরণের আমোদজনক এরূপ সুন্দর গ্রন্থ আর একখানিও নাই। বড় মজাদার পুস্তক। প্রত্যেকের পাঠ করা কর্ত্তব্য।

সমস্ত সংবাদপত্রে প্রশংসিত হিন্দু নরনারীর আদরের ধন, নূতন পুস্তক—

নিত্য-পূজা পদ্ধতি।

অনেক দিনের পর অভাব ঘুচিল! স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত এই পুস্তকের সাহায্যে নিজে নিজে পূজা আহ্নিক শিখিতে পারিবেন। এতদিন ধরিয়া যে পুস্তকের যথার্থই অভাব ছিল, তাহা বিশদ-রূপে ও বিশুদ্ধ ভাবে শ্রেণী বিভাগ করিয়া প্রকাশিত হইল। অন্য পুস্তকের ন্যায় ইহা আবর্জ্জনা ও ভ্রমপূর্ণ নহে, কিম্বা বিশৃঙ্খল ভাবে সন্নিবিষ্ট বা অসম্পূর্ণ নহে। ইহা কিরূপ উপাদেয় ও সুন্দর ভাবে সজ্জীকৃত হইয়াছে, তাহা একবার দেখুন। এমন সুন্দর মনের মতন গ্রন্থ আজ পর্য্যন্ত হয় নাই এবং হইতেও পারে না।

এই মহা মূল্যবান্ সাধের গ্রন্থখানি ৪ খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে। ১ম খণ্ডে—নিত্যকর্ম্মবিধি, ২য় খণ্ডে পূজাবিধি, ৩য় খণ্ডে স্তব স্তোত্র ও কবচ এবং ৪র্থ খণ্ডে পূজা ও ব্রতের কথা এবং মেয়েলি ব্রতের ছড়া আছে। এতদ্ভিন্ন মুদ্রা প্রকরণ সমস্ত ছবি দিয়া বুঝান হইয়াছে। সুতরাং এরূপ মনোমুগ্ধকর ও চিত্তাকর্ষক নিত্য প্রয়োজনীয় গ্রন্থখানি লইয়া অর্থের সদ্ব্যবহার করুন। এমন বৃহৎ ব্যাপার, অথচ মূল্য অতি সুলভ, কেবল মাত্র আট আনা। ২৫০ পৃষ্ঠা, সুন্দর বাঁধান। সত্বর লইয়া পারমার্থিক উন্নতি লাভ করুন।